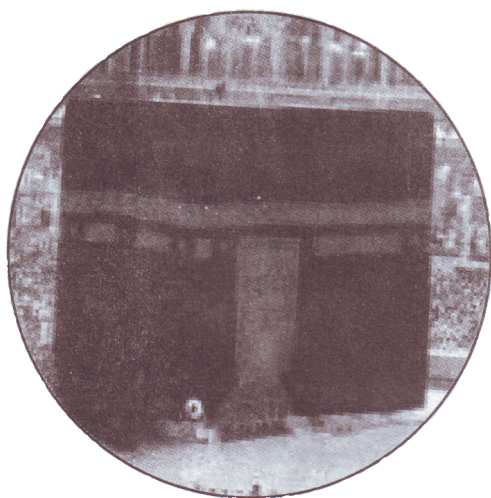


নামাজের নিয়ম





bvgv†Ri wbgg

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ প্রণীত

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া
ভুইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

bgv†Ri ‡bqg

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ প্রণীত

প্রকাশক :

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া

ভুইগড়, নারায়ণগঞ্জ

প্রচ্ছদ : আনোয়ার হোসেন

দ্বাদশ সংস্করণঃ

১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ ইং,

২৪ মুহররম ১৪২৯ হিজরী

মুদ্রণেঃ শওকত প্রিন্টার্স

১৯০/বি, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০।

হাদিয়া : পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র।

NAMAZER NIYAM : Collection of Masaeylls (Decisions of Shariah to perform salat) by Mohammad Mamunur Rashid and Published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Hadiya –Taka Forty Five Only. US \$ 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর জন্য। যাবতীয় প্রকারের উৎকৃষ্ট দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন এবং সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম রদিয়াল্লাহু আনহুম এর প্রতি। আল্লাহুমা আমিন।

জানা উচিত, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকারের সৌভাগ্য নির্ভর করে শরীয়তে মোহাম্মদী প্রতিপালনের প্রতি। আর শরীয়তের মূল হুকুম হচ্ছে নামাজ। তাই প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ রমণীদের জন্য নামাজের নিয়ম কানুন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অতি প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই রচিত হলো ‘নামাজের নিয়ম’। আল্লাহপাক নগণ্যতম এই ফকিরের দ্বিনি খেদমতটুকু কবুল করুন। আমিন।

একান্ত আন্তরিকতা এবং যথাসাধ্য সতর্কতা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের মধ্যে ভুল-ত্রুটি থেকে যেতেও পারে। যদি কোনো সহৃদয় আলেম ব্যক্তি এই কেতাবের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেন, তবে পরবর্তী সংস্করণে ত্রুটিসংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহুতায়ালা। যে সকল কেতাবের সহায়তায় ‘নামাজের নিয়ম’ রচিত হয়েছে, সেগুলোর তালিকা এই বইয়ের শেষে লিখে দেয়া হয়েছে।

সর্ব অবস্থায় আল্লাহপাকের সন্তুষ্টিই আমাদের একমাত্র কামনা। আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর প্রতিই প্রত্যাবর্তন আমাদের সকলের।

ওয়াসসালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

১. অজুর নিয়ম		১০
২. গোসলের নিয়ম		১৩
৩. গোসলের সুন্নত নিয়ম		১৪
৪. তায়াম্মুমের নিয়ম		১৬
৫. এস্তেঞ্জার নিয়ম		১৭
৬. হায়েজের বিবরণ		১৯
৭. নেফাসের বিবরণ		২১
৮. এস্তেহাযার বিবরণ		২৩
৯. নাপাকির বিবরণ		২৩
১০. নাপাকি দূর করবার নিয়ম		২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

১১. শরীয়তের দলিল		২৯
-------------------	-------	----

তৃতীয় অধ্যায়

১২. নামাজের সময়		৩২
১৩. নামাজের নিষিদ্ধ সময়		৩৩
১৪. নামাজের মাকরুহ সময়		৩৪
১৫. আযানের নিয়ম		৩৫
১৬. একামত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য		৩৬
১৭. নামাজ কয় রাকাত পড়তে হবে		৩৭
১৮. নামাজের পূর্বশর্ত		৩৮
১৯. নামাজ অবস্থায় ৬টি কাজ ফরজ		৪২
২০. নামাজের ওয়াজিবসমূহ		৪৬
২১. সোহ্ সেজদা কাকে বলে		৪৮
২২. নামাজের সুন্নতসমূহ		৫১
২৩. নামাজের মোস্তাহাবসমূহ		৫২
২৪. যে সব কারণে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়		৫৪
২৫. যে সমস্ত কারণে নামাজ মাকরুহ হয়		৫৫

চতুর্থ অধ্যায়

২৬. নামাজের মধ্যে যে সকল দোয়া কালাম পড়তে হয়		৫৮
২৭. কয়েকটি সূরা		৬২

পঞ্চম অধ্যায়

২৮. নামাজ আদায়ের নিয়ম		৬৮
২৯. পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পার্থক্য		৭০

৩০. নামাজের জামাত		৭১
৩১. ইমামের যোগ্যতা ও দায়িত্ব		৭২
৩২. যে ইমামের পিছনে নামাজ বৈধ		৭৩
৩৩. যে ইমামের পিছনে নামাজ জায়েজ নয়		৭৩
৩৪. ইমাম ও মোক্তাদীর অবস্থান		৭৪
৩৫. ইমামের পিছনে মোক্তাদীর করণীয়		৭৪
৩৬. লাহেক এবং মাসবুক সম্পর্কে জ্ঞাতব্য		৭৬
৩৭. সুতরা		৭৮
৩৮. বিতির নামাজ		৭৯
৩৯. বিতির নামাজের পর		৮১
৪০. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পর্কে পুনরালোচনা		৮১

ষষ্ঠ অধ্যায়

৪১. জুমআর নামাজ		৮৬
৪২. জুমআর দিনের করণীয়		৮৭
৪৩. খোতবা প্রসঙ্গে		৮৮
৪৪. জুমআর নামাজ পড়ার নিয়ম		৯০
৪৫. ঈদুল ফিতরের নামাজ		৯০
৪৬. ঈদুল আজহার নামাজ		৯২
৪৭. তারাবীহ নামাজ		৯৩
৪৮. কাজা নামাজ		৯৬
৪৯. মোসাফিরের নামাজ		৯৮
৫০. অসুস্থ অবস্থার নামাজ		১০০
৫১. তেলাওয়াতের সেজদা		১০০
৫২. নফল নামাজ		১০২

শেষ অধ্যায়

৫৩. মৃত্যুর সময় করণীয় কাজ		১০৬
৫৪. মৃত্যুর পর করণীয় কাজ		১০৭
৫৫. মৃতদেহের গোসল করানোর নিয়ম		১০৭
৫৬. জানাজা বহন করার নিয়ম		১০৯
৫৭. জানাজার নামাজের সময়		১০৯
৫৮. জানাজার নামাজের নিয়ম		১০৯
৫৯. দাফনের নিয়ম		১১১

সর্বশেষ অধ্যায়

৬০. নামাজের সময়সূচী		১১৩
৬১. দূরত্বের কমবেশীর জন্য সময়ের তারতম্য		১১৪
৬২. শেষ বক্তব্য		১১৫
৬৩. নামাজ, সেহরী ও ইফতারের সময় সূচী		১১৬

আমাদের অন্যান্য বই

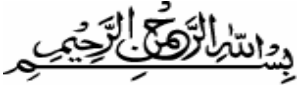
- q তাফসীরে মাযহারী (১-১২) মোট ১২ খণ্ড।
- q মাদারেজুন নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- q মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- q মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- q মাব্দা ওয়া মা'আদ
- q মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড

- q নূরে সেরহিন্দ
- q নকশায়ে নকশবন্দ
- q বায়ানুল বাকী
- q জীলান সূর্যের হাতছানি
- q চেরাগে চিশ্তি
- q কালিয়ারের কুতুব
- q প্রথম পরিবার
- q মহাপ্রেমিক মুসা
- q তুমিতো মোর্শেদ মহান নবীনন্দিনী

- q পিতা ইব্রাহীম
- q আবার আসবেন তিনি
- q সুন্দর ইতিবৃত্ত
- q ফোরাতের তীর
- q মহাপ্লাবনের কাহিনী
- q দুজন বাদশাহ যারা নবী ছিলেন
- q কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

- q THE PATH
- q পথ পরিচিতি
- q নামাজের নিয়ম
- q রমজান মাস
- q BASICS IN ISLAM
- q ইসলামী বিশ্বাস
- q মালাবুদ্দা মিনহ্

- q সোনার শিকল
- q বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- q সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- q তৃষিত তিথির অতিথি
- q ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- q নীড়ে তার নীল ঢেউ
- q ধীরে সুর বিলম্বিত ব্যথা



প্রথম অধ্যায়

আমরা আল্লাহুতায়ালার বান্দা। আল্লাহুতায়ালাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স. এর উম্মত হবার সুযোগ দান করেছেন। এর চেয়ে উত্তম অনুগ্রহ আর কিছুই হতে পারে না। পরম দয়ালু আল্লাহুতায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহুতায়ালার জন্য।

বান্দার কাজ তার প্রভুর এবাদত করা। আল্লাহুপাক আমাদের প্রতি যত প্রকার এবাদত ফরজ করেছেন, তার মধ্যে নামাজ সর্বোত্তম এবং সর্বপ্রধান। কোরআন মাজিদে বিরশিবার নামাজ পড়ার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তাই প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারীর জন্য নামাজ পাঠ করা অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহুপাক দিন-রাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যারা নামাজ পড়ে না তারা মহাপাপী। বে-নামাজীরা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত। কেয়ামতের দিন বে-নামাজীগণকে কাফেরদের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেয়া হবে। আরো বর্ণিত হয়েছে, নামাজ দ্বীনের স্তম্ভ। যে নামাজ কয়েম করলো, সে দ্বীনকে কয়েম করলো। যে এই স্তম্ভটি ভেঙে ফেললো, সে তার দ্বীনকে বরবাদ করে ফেললো। আরো বর্ণিত হয়েছে— কেয়ামতের ময়দানে নামাজীরা নবী, শহীদ এবং অলিগণের সঙ্গে থাকবে এবং বে-নামাজীরা থাকবে ফেরাউন, হামান এবং কারুনের মতো কাফেরদের সঙ্গে।

অতএব সাবধান। নামাজ পড়তেই হবে।

নামাজ পড়া যেমন ফরজ, নামাজ পড়বার নিয়ম কানুন জানাও তেমনি ফরজ। আসুন, এবার আমরা নামাজের নিয়ম কানুন শিক্ষায় মনোযোগী হই।

নামাজ পড়তে হলে প্রথমে অজু করতে হবে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করে পবিত্র হতে হবে। বিনা অজুতে নামাজ হয় না। গোসল ফরজ হয়ে গেলে বিনা গোসলে শুধুমাত্র অজু করলেও নামাজ হয় না। তাই প্রথমে আমরা অজু গোসলের নিয়ম জানবো।

অজুর নিয়ম

বিস্মিল্লাহ্ বলে অজু শুরু করতে হবে। প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর তিনবার কুলি করতে হবে এবং মেছওয়াক করতে হবে। মেছওয়াক না থাকলে হাতের আঙ্গুল দিয়ে ভালো করে দাঁত মেজে নিতে হবে। এরপর তিনবার নাকে পানি দিতে হবে। বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল তিনবার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর ডান হাতের এবং বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর সমস্ত মাথা একবার মাসেহ্ করে নিতে হবে। এরপর দুই হাতের পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহ্ করতে হবে। সবশেষে ডান পা এবং বাম পা টাখনা (পায়ের ছোট গিরা) সহ তিনবার ধুয়ে নিতে হবে।

উপরের নিয়মে অজু করলেই অজু হয়ে যায়।

জানা প্রয়োজন অজুর মধ্যে চারটি কাজ ফরজ। যেমন—

১. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধোয়া
২. কনুইসহ দুই হাত একবার ধোয়া
৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা
৪. টাখনাসহ দুই পা একবার ধোয়া।

অজুর মধ্যে দশটি কাজ সুন্নত। যেমন—

১. বিস্মিল্লাহ্ বলে অজু শুরু করা
২. কবজিসহ দুই হাত তিনবার ধোয়া
৩. কুলি করা
৪. নাকে পানি দেওয়া
৫. মেছওয়াক করা
৬. সমস্ত মাথা একবার মাসেহ্ করা
৭. মুখমণ্ডল, হাত এবং দুই পা তিনবার করে ধোয়া
৮. কান মাসেহ্ করা
৯. হাতের আঙ্গুল খেলাল করা
১০. পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা।

উপরে বর্ণিত ফরজ ও সুন্নত বাদে বাকী কাজগুলো মোস্তাহাব। জানা প্রয়োজন যে, কোনো ফরজ বাদ পড়লে অথবা অসম্পূর্ণ হলে অজু হবে না। সুন্নত বাদ পড়লে সুন্নতের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

অজু সম্পর্কে আরো কিছু জরুরী নিয়ম কানুন জানা থাকা প্রয়োজন। নীচে সেগুলো দেয়া হলো।

১. মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেনো মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনি পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত ধোয়া হয়। দুই হাতের সাহায্যে ভালোভাবে মুখমণ্ডল ধুতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেনো দুই দ্রুত পশমের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়। যদি মুখ এবং চোখ এরকম জোর করে বন্ধ করে রাখা হয়, যাতে চোখের পাতা অথবা ঠোঁটের কিছু অংশ শুকনা থাকে, তবে অজু হবে না।

২. পুরুষগণ মুখমণ্ডল ধোয়ার পর ভিজা হাতের আঙ্গুল দিয়ে দাড়ি খেলাল করবে। তিনবারের বেশি খেলাল করবে না।

৩. অজুর মধ্যে থুতনি ধোয়া ফরজ। থুতনিতে দাড়ি থাকুক বা না থাকুক।

৪. মুখ বন্ধ করলে ঠোঁটের যে অংশ স্বাভাবিকভাবে দেখা যায়, সে অংশ ধোয়া ফরজ।

৫. দাড়ি, মোচ অথবা দ্রুত অত্যধিক ঘন হওয়ার কারণে নীচের চামড়া না দেখা গেলে চামড়া ধোয়া ফরজ নয়। পশমের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে দিলেই ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

৬. হাতে আংটি থাকলে আংটির নীচের চামড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে। মেয়েদের চুড়ি, বালা, নাকের নখের নীচের চামড়াতেও পানি পৌঁছাতে হবে।

৭. নখের ভিতরে আটা বা চুন ঢুকে শক্ত হয়ে থাকার কারণে যদি নখের ভিতরে পানি না যায়, তবে তৎক্ষণাৎ আটা বা চুন বের করে সেখানে পানি ঢেলে দিতে হবে।

৮. এক অঙ্গ ধোয়ার পর আর এক অঙ্গ ধুতে এত দেরী করা ঠিক নয়, যাতে ইতোমধ্যে প্রথম অঙ্গ শুকিয়ে যায়। এরকম করা সুন্নতের খেলাফ।

৯. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় বিস্মিল্লাহ ও কলেমা পড়বে।

১০. পানি যতোই বেশি থাকুক না কেনো, এমনকি নদীতে অজু করলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করবে না। আবার এত কম পানিও ব্যবহার করবে না, যাতে কোনো অঙ্গ শুকনা থাকার আশংকা থাকে।

১১. প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় হাত দিয়ে ঘষে মেজে ধোয়া সুন্নত। শীতকালে এরকম করা বেশি জরুরী।

১২. হাতের বা পায়ের নখে নখপালিশ থাকলে তা ঘষে তুলে ফেলে অঙ্গ করতে হবে।

১৩. অঙ্গ করার পর যদি দেখা যায় হাতের বা পায়ের কোনো অংশ শুকনা আছে, তবে সে অংশে পানি প্রবাহিত করে দিতে হবে। শুধু ভিজা হাতে মুছলে অঙ্গ হবে না।

১৪. ডান দিক থেকে অঙ্গ শুরু করতে হবে। কেবলমুখী হয়ে অঙ্গ করা ভালো। অঙ্গ শেষে কলেমা শাহাদত পড়তে হবে। অঙ্গ শেষে সূরা কদর পড়লেও ফজিলত পাওয়া যায়। এই কাজগুলো মোস্তাহাব।

১৫. অঙ্গ করার সময় কথাবার্তা বলা, ডান হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, প্রয়োজনের বেশি পানি ব্যবহার করা, নাপাক স্থানে বসে অঙ্গ করা— এই সকল কাজ মাকরুহ (অপছন্দনীয়)।

যে সকল কারণে অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়— সেগুলো নীচে উল্লেখ করা হলো—

১. প্রস্রাব, পায়খানা করলে।
২. পায়খানার রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হলে।
৩. শরীরের কোনো অংশ থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে।
৪. নিদ্রাভিত্ত হলে।
৫. মুখ ভরে বমি করলে।
৬. নামাজের মধ্যে সশব্দে হাসলে।
৭. পাগল বা মাতাল হলে অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়।
৮. অট্টহাসি হাসলেও অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়।
৯. মলদ্বার দিয়ে কৃমি বের হলে অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়।

১০. যদি কারো নাক দিয়ে কোনো বস্তু ঢুকে মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় তবে অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. বেহুঁশ হয়ে গেলে অঙ্গ চলে যায়।

এ প্রসঙ্গে আরো কিছু নিয়ম ভালোভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন।

১. যদি মুখ দিয়ে থুথুর সাথে রক্ত আসে তবে দেখতে হবে, রক্তের অংশ বেশী, না থুথুর অংশ বেশী। যদি রক্তের পরিমাণ থুথুর চেয়ে বেশী বা সমান সমান হয়, তবে অঙ্গ ভেঙ্গে যাবে। রং দেখে পরিমাণ বুঝে নিতে হবে। রং লাল হলে অঙ্গ চলে যাবে। হলুদ হলে যাবে না।

২. কোনো কিছুর আঘাতে অথবা মেছওয়াকের কারণে রক্তের চিহ্ন দেখা গেলে অঙ্গ যাবে না, যতক্ষণ না রক্ত প্রবাহিত হয়ে মুখ থেকে বের হয়ে আসে।

৩. অটুহাসি হাসলে অজু নষ্ট হয়। তায়াম্মুমও নষ্ট হয়। কিন্তু গোসলের পবিত্রতা নষ্ট হয় না।

৪. স্ত্রী পুরুষকে অথবা পুরুষ স্ত্রীকে স্পর্শ করলে অজু নষ্ট হয় না।

৫. নিজের অথবা অন্যের লজ্জাস্থানে হাত পড়লে অজু নষ্ট হয় না। গোসলের পর কাপড় বদলাবার সময় যদি হাত লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তবে অজু যায় না। লজ্জাস্থানের প্রতি নজর পড়লেও অজু যায় না।

৬. যে ব্যক্তির অজু ছিলো হঠাৎ সন্দেহ হলো যে, অজু আছে কিনা, তবে ঐ ব্যক্তির অজু শুদ্ধ আছে বলে ধরে নিতে হবে।

৭. প্রথম অবস্থায় অজু ছিলো না, পরে অজু করে নিয়েছে কি না— এ বিষয়ে সন্দেহের উদ্বেক হলে অজু নেই ধরে নিতে হবে।

অজু তিন প্রকার। যেমন—

১. ফরজ অজু— নামাজ পড়ার জন্য যে অজু করা হয়।

২. ওয়াজেব অজু— যা কাবা শরীফ তওয়াফ করার জন্য করা হয়।

৩. মোস্তাহাব অজু— যা শরীর পবিত্র রাখার জন্য করা হয়।

বে-অজু অবস্থায় কি কি করা যায় না, সে সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. বে-অজু অবস্থায় কোরআন শরীফ অথবা ছিপারা স্পর্শ করা মাকরুহ তাহরিমী (অত্যন্ত অপছন্দনীয়)।

২. বিনা অজুতে কোরআনের আয়াত লেখাও মাকরুহ।

৩. নাবালক ছেলে মেয়েদেরকেও অজু সহকারে কোরআন শরীফ অথবা ছিপারা স্পর্শ করার শিক্ষা দেয়া উচিত।

৪. হাদিস, তফসীর, ফেকাহ্ এবং তাসাওয়াফের বইও অজু সহযোগে স্পর্শ করা ভালো।

৫. পেশাব পায়খানার পর অথবা বায়ু নির্গত হলে অথবা ঘুম থেকে উঠলে অজু করে নেয়া ভালো, কিন্তু না করলে কোনো গোনাহ্ হবে না।

গোসলের নিয়ম

গোসলের ফরজ তিনটি। যেমন—

১. গড়গড়াসহ কুলি করা।

২. নাকে পানি দেয়া।

৩. সমস্ত শরীর এমনভাবে ধুয়ে ফেলা যাতে একটি পশমের গোড়াও শুকনা না থাকে।

গোসলের সূত্র নিয়ম

১. প্রথমে নিয়ত করতে হবে।
২. তারপর বিসমিল্লাহ পড়তে হবে।
৩. তারপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।
৪. শরীরের কোনো অংশে নাপাকি লেগে থাকলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে।
৫. পা ধোয়া বাদ রেখে অজু করতে হবে।

৬. তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতে হবে। প্রথমে মাথায়, তারপর ডান কাঁধের উপর, তারপর বাম কাঁধের উপর পানি ঢেলে শরীর ঘষে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। শেষে পা ধুয়ে ফেলতে হবে। গোসলের পর কলেমা শাহাদত পড়তে হবে।

উপরোক্ত নিয়মে গোসল করলে গোসল অজু সবই হয়ে যায়। নতুন করে অজু করার দরকার হয় না। বরং গোসলের পর নতুন করে অজু করা মাকরুহ।

গোসলের বিষয়ে আরো কিছু জানবার আছে। নীচে সেগুলোর উল্লেখ করা হলো।

১. সমস্ত শরীরের একটি পশম পরিমাণ জায়গাও যদি শুকনা থাকে, তবে গোসল হবে না। এইরূপ কুলি করতে বা নাকে পানি দিতে ভুলে গেলেও গোসল হবে না। গোসলের আগে যেমন নাপাক ছিলো, তেমনি নাপাকই থাকবে।

২. গোসল শেষে যদি কোনো স্থান শুকনা আছে বলে মনে হয়, তবে সে স্থানটুকু ধুয়ে ফেললেই হবে। নতুন করে গোসল শুরু করার দরকার নেই। কুলি করার কথা ভুলে গেলে শুধু কুলি করতে হবে। নাকে পানি দেওয়ার কথা ভুলে গেলে শুধু নাকে পানি দিতে হবে।

৩. ফরজ গোসলের সময় কেবলার দিকে মুখ করা যাবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করাও ভালো নয়। আবার ভালোমতো গোসল করা যায় না, এরকম কম পানিও ব্যবহার করা অনুচিত।

৪. মাথার চুলের গোড়াও শুকনা থাকা চলবে না।

৫. মেয়েদের কোনো অঙ্গে অলংকার থাকলে তা নেড়ে চেড়ে অলংকারের নীচের চামড়ায় বা ছিদ্রপথে পানি পৌঁছাতে হবে। পুরুষদের আংটিও নেড়ে চেড়ে তার নীচের চামড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে।

৬. নখের মধ্যে বা অন্য কোথাও আটা, চুন ইত্যাদি শুকিয়ে জমে থাকলে, তা তুলে ফেলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৭. কান এবং নাভিমূলেও পানি পৌঁছাতে হবে। না হলে গোসল হবে না।

৮. চুলে বা হাতে পায়ে তেল লাগানোর কারণে যদি পানি ঢালার সঙ্গে সঙ্গে পানি ভাল করে দাঁড়াতে না পারে, তবে তাতে ক্ষতি নেই। তেলের উপর দিয়ে পানি গড়িয়ে গেলেও গোসল হয়ে যাবে।

৯. যদি দাঁতের ফাঁকে সুপারি বা কোনো খাদ্যকণা লেগে থাকে তবে তা বের করে ফেলে কুলি করতে হবে। কারণ, দাঁতের গোড়ায় পানি না পৌঁছলে গোসল হবে না।

১০. হাতে বা পায়ের নখে নখপালিশ থাকলে তা ঘষে তুলে ফেলে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

১১. চোখে পিচুটি জমে থাকলে তা তুলে ফেলে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। না হলে অজু গোসল কিছুই হবে না।

তিন কারণে গোসল ফরজ হয়। যেমন—

১. স্ত্রী সহবাস করলে ২. স্বপ্নদোষ অথবা অন্য যে কোনো কারণে যৌন উত্তেজনায় বীর্যস্খলন হলে। এরকম অবস্থায় পুরুষ রমণী উভয়ের জন্য গোসল ফরজ হয় ৩. মেয়েদের হায়েজ এবং নেফাছ বন্ধ হলে।

এ সম্পর্কে আরো কিছু বিষয় জানা প্রয়োজন। যেমন—

১. যৌন উত্তেজনার সময় প্রথমে যে পানি বের হয় তাকে মজি বলে। আর প্রবল উত্তেজনা সহ যে পানি বের হয় তাকে মনি (বীর্য) বলে। মজি এবং মনির পার্থক্য এই— মজি বের হলে উত্তেজনা কমে না, বরং বাড়ে। মনি বের হলে উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। মজি বের হলে অজু নষ্ট হয়। কিন্তু গোসল ফরজ হয় না। আর মনি বের হলে গোসল ফরজ হয়ে যায়।

২. পুরুষের যৌনাস্রের শুধুমাত্র খতনার স্থান স্ত্রীর অঙ্গে প্রবেশ করালেই গোসল ফরজ হয়ে যায়, বীর্যস্খলন না হলেও।

৩. কোনো রোগের কারণে বিনা যৌন উত্তেজনায় যদি বীর্যস্খলন হয়, তবে শুধু অজু ভঙ্গ হয়। গোসল ফরজ হয় না।

৪. গোসল ফরজ হওয়ার পর গোসলের আগে যদি কোনো কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে হাত মুখ ধুয়ে কুলি করে খাওয়া উত্তম। এরকম না করে খেলেও গোনাহ হবে না।

৫. মেয়েদের যে রক্ত প্রবাহ হয়, তা তিন প্রকার। হায়েজ (মাসিক রক্তস্রাব), নেফাস (সন্তান প্রসবের পর প্রস্রাবের পথ দিয়ে যে রক্ত নির্গত হয়) এবং এস্তেহাযা। হায়েজ ও নেফাস শেষে গোসল ফরজ হয়। কারণ, হায়েজ এবং নেফাসের রক্ত জরায়ু থেকে আসে। আর এস্তেহাযার রক্ত আসে শরীরের কোনো বিশেষ রগ থেকে।

বে-গোসল অবস্থায় কি কি করা যায় না সে সম্পর্কেও জানা থাকা প্রয়োজন।

এবার সে সকল নিয়ম জেনে নেয়া যাক।

১. গোসল ফরজ হয়েছে এরকম ব্যক্তির জন্য কোরআন শরীফ স্পর্শ করা, কোরআন শরীফ পাঠ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।

২. মসজিদে নিদ্রামগ্ন কোনো ব্যক্তির যদি স্বপ্নদোষ হয়, তবে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে তায়াম্মুম করে মসজিদ থেকে বের হয়ে গোসল করে নেয়া উচিত।

৩. ঈদগাহ, খানকা, মাদ্রাসা, কবরস্থান- এ সকল জায়গায় বে-গোসল অবস্থায় প্রবেশ করা হারাম নয়। এ অবস্থায় কোনো মুসলমানের সঙ্গে মোলাকাত এবং মোছাফাহা করাও হারাম নয়।

৪. হায়েজ নেফাস অবস্থায় স্ত্রীর হাতের পানি পাক। এরকম অবস্থায় একসঙ্গে খাওয়া, এক গ্লাসের পানি পান করা, এক সঙ্গে ভাত খাওয়া, স্ত্রীকে চুম্বন করা জায়েয (বৈধ)। স্ত্রীকে কাপড়ের উপর দিয়ে আলিঙ্গন করা, এক বিছানায় শোয়া সবই জায়েয। এগুলোকে নাজায়েজ মনে করা গোনাহ্। তবে এ অবস্থায় সহবাস করা হারাম।

৫. হায়েজ নেফাস অবস্থায় কোরআন শরীফ বা কোরআন শরীফের কোনো আয়াত পড়া নাজায়েয। কিন্তু কলেমা শরীফ পড়া, দরুদ শরীফ পড়া এবং আল্লাহর জিকির করা নাজায়েয নয়।

তায়াম্মুমের নিয়ম

অজু এবং গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে পবিত্র হওয়ার বিধান আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত অবস্থার সৃষ্টি হলেই কেবল তায়াম্মুম করা জায়েয হবে। অন্যথায় নয়।

১. পানি ব্যবহারের কারণে যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তির রোগবৃদ্ধির আশংকা থাকে।

২. পানি ব্যবহারের কারণে যদি রোগমুক্তি বিলম্বিত হবার আশংকা থাকে।

৩. অত্যধিক শীতের সময় পানি ব্যবহারের কারণে প্রাণনাশের আশংকা থাকলে বা রোগগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকলে। এমতাবস্থায় গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি পানি গরম করবার সামর্থ্য না থাকে- কেবল তখনই তায়াম্মুম জায়েয হবে।

৪. যদি পানি একান্তই না পাওয়া যায়, পাওয়া গেলেও যদি শরয়ী এক মাইল (ইংরেজী সোয়া মাইল) পথ পাড়ি দিতে হয়।

৫. পানি সংগ্রহ করতে গেলে যদি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথবা যদি হিংস্র কোনো জীবজন্তুর আক্রমণের আশংকা থাকে।

৬. হায়েজ নেফাস শেষে পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে।

৭. যদি পানি কিনতে হয়, তবে ক্রয়মূল্য সঙ্গে না থাকলে।

পুরুষ স্ত্রীলোক নির্বিশেষে অজু ও গোসল করতে অক্ষম সকলেই তায়াম্মুম করে সকল প্রকার এবাদত করতে পারে। অজুর তায়াম্মুম এবং গোসলের তায়াম্মুম একই রকম— এতে কোনো পার্থক্য নেই।

নিম্নে বর্ণিত জিনিসগুলো দ্বারা তায়াম্মুম করা যায়।

১. পাক মাটি অথবা মাটিজাত অন্যান্য পদার্থ যেমন— মাটি, বালি, পাথর, চুন, সুরকি ইত্যাদি।

২. পাক কাপড়ে বা অন্য কোনো পদার্থের উপরে যদি বেশী ধূলা জমে থাকে, তবে তা দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে।

তায়াম্মুমের ফরজ (অপরিহার্য কর্তব্য) তিনটিঃ—

১. নিয়ত করা (আমি পবিত্র হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করছি— মনে মনে এরকম সংকল্প রাখতে হবে)।

২. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ্ করা। এবং

৩. দুই হাত কনুইসহ একবার মাসেহ্ করা।

প্রথমবার দুইহাত মাটিতে মেরে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ্ করতে হবে। পুনরায় দুইহাত মাটিতে মেরে কনুইসহ দুইহাত ভালো করে মাসেহ্ করে নিতে হবে। তায়াম্মুমের তিনটি ফরজ আদায় হলেই তায়াম্মুম হয়ে যাবে। এতে সুন্নত, মোস্তাহাব বলে আর কিছু নেই।

যে সকল কারণে অজু ভঙ্গ হয়, সে সকল কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া পানি পাওয়া গেলে এবং পানি ব্যবহারের শক্তি অর্জন করলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়। যেমন— রোগী রোগমুক্ত হলে বা রোগগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দূর হয়ে গেলে।

এবার এস্তেঞ্জার নিয়ম কানুন সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক—

এস্তেঞ্জার নিয়ম

পেশাব ও পায়খানা থেকে পবিত্র হওয়াকে এস্তেঞ্জা বলে।

পুরুষ মানুষের পেশাবের নালি অনেক লম্বা ও পেঁচানো। প্রস্রাব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশাবের ধারা বন্ধ হয় না। তাই পেশাব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি

দ্বারা লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেললে ধীরে ধীরে পেশাব বের হয়ে শরীর ও কাপড় নাপাক হয়ে যায়। এ অবস্থায় অজু করলে অজু হবে না। আর অজু না হলে নামাজও হবে না।

পেশাব থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য তাই কুলুখ নেয়ার প্রয়োজন হয়। মাটির ঢেলা পেশাবের রাস্তায় লাগিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলে যখন দৃঢ় ধারণা হয় যে, পেশাবের দ্বারা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন পানি দিয়ে লজ্জাস্থানের অগ্রভাগ ধুয়ে ফেলতে হবে। কয় পা হাঁটতে হবে তার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। তবে সাধারণতঃ চল্লিশ কদম হাঁটলে আর সন্দেহ থাকে না।

মেয়েদের পেশাবের নালি পেঁচানো এবং দীর্ঘ নয়। তাই তাদের জন্য পেশাবের পর কুলুখ নেয়ার প্রয়োজন নেই। প্রস্রাব শেষে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেই চলবে।

পায়খানার পর পুরুষ নারী সকলের জন্য পানি দ্বারা ধুয়ে নিলেই চলবে। তবে এ অবস্থাতেও প্রথমে ঢিলা দ্বারা কুলুখ করে নেয়ার পর পানি দ্বারা ধৌত করা মোস্তাহাব। ঢিলার সংখ্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। প্রয়োজনবশতঃ এক, তিন বা যে কোনো বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা যেতে পারে।

কুলুখের জন্য মাটির ঢিলা ছাড়াও পাথর, মাটি, বালি, তুলা এবং কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করা যেতে পারে, কুলুখের জন্য প্রস্তুতকৃত টয়লেট পেপার ব্যবহার করাতেও কোনো দোষ নেই।

হাড়, নাপাক জিনিস, গোবর, কয়লা, কাঁচ, লেখাপড়ার জন্য প্রস্তুতকৃত এবং ব্যবহৃত কাগজ, পাকা ইট- এসব বস্তু কুলুখ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। আরো খেয়াল রাখতে হবে যেনো এস্তেঞ্জার সময় অন্য মানুষের নিকট নিজের সতর অনাবৃত না হয়ে পড়ে। অবশ্য বন্ধ পায়খানা বা প্রস্রাবখানায় প্রয়োজন মত সতর খোলাতে কোনো দোষ নেই।

পেশাব পায়খানার সময় আরো কয়েকটি আদব মেনে চলতে হবে। যেমন:-

১. কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে এস্তেঞ্জা করা যাবে না।

২. দাঁড়িয়ে পেশাব পায়খানা করা যাবে না।

৩. খালি মাথায় পায়খানায় যাওয়া নিষেধ।

৪. ঢোকার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে পায়খানায় ঢুকতে হবে এবং বের হবার সময় ডান পা আগে বের করতে হবে।

৫. এ সময় মুখে আল্লাহর জিকির করা যাবে না। আজান বা সালামের জবাব দেয়া যাবে না। খুতু ফেলা, নাক ঝাড়া, গলা খাকরানো, এদিক সেদিক দেখা,

আকাশের দিকে তাকানো, নিজের শরীরের সঙ্গে খেলা করা, আবশ্যিক ছাড়া নিজের সতর দেখা— এ সকল কাজ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হাঁচি এলে মনে মনে ‘আলহামদুলিল্লাহ্’ বলতে হবে।

৬. হাতের আংটিতে আল্লাহর নাম বা কোরআনের কোনো আয়াত লেখা থাকলে তা খুলে রেখে এস্তেঞ্জায় যেতে হবে।

যে সকল স্থানে এস্তেঞ্জা করা নিষেধ সে সকল স্থান হচ্ছেঃ কবরস্থান, প্রবাহিত পানি, বন্ধ জলাশয়, ফলদার গাছের নীচে, শস্যের ক্ষেতে, মানুষ চলাচলের রাস্তায়, যে গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে, মসজিদ বা ঈদগাহের সামনে, অজু-গোসলের স্থানে, হুঁদুর, সাপ বা পিঁপড়ার গর্তে।

পায়খানা পেশাবখানায় প্রবেশের পূর্বে এই দোয়া পড়তে হবে—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণঃ ‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবছে ওয়াল খাবায়িছ’।
বের হবার পর এই দোয়া পড়তে হবে—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَ عَافَانِي

উচ্চারণঃ ‘আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আজহাবা আন্নিলা আজা ওয়া আফানী’।

এরকম দোয়া পড়া মোস্তাহাব।

এস্তেঞ্জায় পানি ব্যবহারের পর যদি পাত্রে পানি অবশিষ্ট থাকে, তবে সে পানি দ্বারা অজু করা যায়। আবার অজুর পরের অবশিষ্ট পানি দিয়েও এস্তেঞ্জা করা যায়। তবে এরকম না করাই ভালো।

এবার হায়েজ, নেফাস ও এস্তেহযার নিয়ম কানুন সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক।

হায়েজের বিবরণ

মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাবকে হায়েজ বলে। সর্বনিম্ন বয়স ৯ বৎসর থেকে হায়েজ শুরু হতে পারে। আবার সর্বোচ্চ ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত হায়েজ জারী থাকতে পারে। তবে সাধারণতঃ ৫৫ বৎসর বয়সের সময়ই হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়।

হায়েজের সময়সীমা নিম্নে ৩ দিন। উর্ধ্বে ১০ দিন। ৩ দিন ৩ রাত্রির কম সময় রক্তস্রাব হলে তাকে হায়েজ বলা যাবে না। আবার ১০ দিন ১০ রাত্রির পরও

যদি রক্তস্রাব হতে থাকে, তবে ১০ দিনের পরের সময়কে এস্তেহাযা বলতে হবে। এস্তেহাযা একটি রোগ বিশেষ।

হায়েজ অবস্থায় নামাজ পড়া যাবে না এবং এ সময়ের নামাজ কাজাও পড়তে হবে না। কিন্তু এস্তেহাযার সময়কালীন অজু করে নামাজ পড়ে নিতে হবে।

ঋতুবতী নারীদের মসজিদে প্রবেশ নিষেধ। কাবা শরীফ জেয়ারত করাও নিষেধ। এ অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। কিন্তু এ অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন, নাভির উপরের অংশের শরীর উপভোগ করা স্বামীর জন্য বৈধ। তবে উত্তেজনা বশতঃ সহবাস করার সম্ভাবনা থাকলে এসব থেকেও বিরত থাকা উচিত।

দুই হায়েজের মধ্যবর্তী পবিত্র সময়কে তোহর বলে। তোহরের নিম্ন সময়সীমা ১৫ দিন।

এ সম্পর্কে আরো কিছু নিয়ম কানুন জেনে নেয়া উচিত। যেমনঃ—

১. কোনো রমণীর ৩ দিন হায়েজ হওয়ার নিয়ম ছিলো। হঠাৎ কোনো মাসে দেখা গেলো ৩ দিন পরেও তার রক্তস্রাব জারী আছে। তখন তাকে গোসলও করতে হবে না, নামাজও পড়তে হবে না। মনে করতে হবে নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে। যদি পুরা ১০ দিনের মাথায় অথবা তারও পূর্বে হায়েজ বন্ধ হয়, তবে যে কয়দিন রক্তস্রাব ছিলো ঐ কয়দিনকেই হায়েজের নতুন নিয়ম ধরতে হবে এবং ঐ কয়দিনের নামাজ পড়তে হবে না। কিন্তু রক্তস্রাবের সময়সীমা যদি ১০ দিন অতিক্রম করে যায়, তবে মনে করতে হবে হায়েজ আসলে পূর্বের নিয়মে ৩ দিনই ছিলো। বাকী সময়ের রক্তস্রাব আসলে এস্তেহাযা। অতএব ৩ দিন বাদ দিয়ে বাকী সময়ের নামাজ কাজা পড়ে নিতে হবে।

২. কোনো স্ত্রীলোকের ৫ দিন বা ৯ দিন হায়েজ হওয়ার নিয়ম ছিলো। ঐ সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে গোসল করা ফরজ হয়ে যাবে। গোসল করার আগে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। অবশ্য যদি হায়েজ শেষে বিনা গোসলে কোনো কারণ বশতঃ যদি এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়— তখন সহবাস বৈধ হবে।

৩. কোনো রমণীর ৫ দিন হায়েজের নিয়ম ছিলো। কিন্তু এক মাসে দেখা গেলো ৪ দিন পরই রক্ত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে নামাজ পড়ে নিতে হবে। কিন্তু ৫ দিন পুরা হওয়ার আগে সে স্বামীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে না। কারণ রক্তস্রাব হয়তো আবার শুরু হয়ে যেতে পারে।

৪. যদি ১০ দিন পুরাপুরি রক্তস্রাব হবার পর রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোসলের আগেও সহবাস বৈধ।

৫. যদি কারো হায়েজের নিয়ম ১০ দিনের কম হয় এবং নামাজের প্রায় শেষ ওয়াক্তে এসে হায়েজ বন্ধ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ গোসল করে যদি এতটুকু সময় হাতে থাকে যে, নামাজের নিয়ত করে শুধুমাত্র আল্লাহ্ আকবর বলে তকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামাজে দাঁড়াতে পারে— তবে ঐ ওয়াক্তের নামাজ তার উপরে ওয়াজিব। ঐ নামাজ কাজা পড়তে হবে। এতটুকু সময়ও যদি না থাকে তবেই কেবল ঐ ওয়াক্তের নামাজ মাফ হয়ে যাবে।

৬. অপেক্ষের বাইরে রক্ত না আসা পর্যন্ত হায়েজ ধরা যাবে না। যেমন ছিদ্রের ভিতরে তুলার গান্দি দিয়ে রাখলে যদি রক্ত বন্ধ থাকে, তবে সে সময়কে হায়েজের হিসাবে নেয়া যাবে না। রক্তের চিহ্ন বাইরের চামড়া পর্যন্ত এলে অথবা তুলা টেনে বের করলে হায়েজ শুরু হয়েছে ধরতে হবে।

৭. কোনো মহিলা এশার নামাজ পড়ে পাক অবস্থায় যদি স্ত্রী অপেক্ষের ভিতরে তুলার গান্দি রেখে ঘুমিয়ে পড়ে এবং সকালে ঘুম থেকে জেগে যদি তুলার মধ্যে রক্তের চিহ্ন দেখে, তবে যে সময় রক্তের চিহ্ন দেখে, ঐসময় থেকেই হায়েজ শুরু হয়েছে ধরতে হবে।

৮. রমজান মাসে যদি দিনের বেলায় হায়েজের রক্ত বন্ধ হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে নিতে হবে এবং নামাজের ওয়াক্ত হলে নামাজও পড়ে নিতে হবে। যদিও ঐ দিনে তার রোজা হবে না, কিন্তু ঐ সময় হতে এফতার পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখতে হবে। পরে এই রোজার কাজা করতে হবে।

৯. যদি পূর্ণ ১০ দিনের হায়েজ রাতের এমন সময়ে শেষ হয় যে, তখন গোসল সেরে নিলে মাত্র একবার ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলারও সময় না থাকে, তবুও সকালে রোজা রাখতে হবে। আর ১০ দিনের কম সময়ের হায়েজ যদি রাতের এমন সময়ে এসে শেষ হয় যে, সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে নিলে একবারও ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলার সময় থাকে না— তবু সেদিনের রোজা রাখা জরুরী। এরকম অবস্থায় গোসল না করলেও রোজার নিয়ত করতে হবে। সকালে গোসল করে নিলেই চলবে। আর যদি গোসল করার পরিমাণ সময়ও রাত অবশিষ্ট না থাকে, তবে ঐদিন রোজা রাখা যাবে না। কিন্তু ঐদিন পানাহারও করা যাবে না। রোজাদারদের মতোই সারাদিন অতিবাহিত করতে হবে। পরে এই রোজার কাজাও করতে হবে।

নেফাসের বিবরণ

সন্তান প্রসবের পর পেশাবের রাস্তা দিয়ে যে রক্তস্রাব হয়, তাকে নেফাস বলে। নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন। কন্দের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। যদি কারো দুই ঘণ্টা রক্তস্রাব হয়— তবে ঐ দুই ঘণ্টাই নেফাসের সময়।

নেফাস সম্পর্কে নিম্নের নিয়ম কানুনগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন।

১. প্রসবের পর রক্তস্রাব যদি মোটেও না হয়, তবুও গোসল ফরজ হয়ে যাবে।

২. নেফাসের সময় নামাজ মাফ। কিন্তু রোজার কাজা করতে হবে। এ অবস্থায় নামাজ, রোজা, স্বামীর সঙ্গে সহবাস সবই হারাম।

৩. প্রসবের সময় সন্তানের অর্ধেকের বেশী বের হবার পর যে রক্তস্রাব হয় তাকে নেফাস বলে। প্রসবের পূর্বে রক্তস্রাব হলে তা এন্তেহায়ার মধ্যে গণ্য হবে। প্রসবের পূর্বে হুঁশ অবস্থায় নামাজের ওয়াক্ত এসে পড়লে ঐ ওয়াক্তের নামাজ পড়ে নিতে হবে। প্রসব বেদনায় কষ্ট হলেও ইশারায় নামাজ পড়ে নিতে হবে। তবে নামাজ পড়লে যদি সন্তানের জীবনহানির আশংকা থাকে তবে নামাজ ছেড়ে দেয়া যাবে।

৪. গর্ভপাতের পর যদি সন্তানের এক আধটা অঙ্গ পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হয়, তবে গর্ভপাতের পরের রক্তস্রাবকে নেফাস বলে ধরতে হবে। আর যদি সন্তানের কোনো আকৃতি দৃষ্টিগোচর না হয়, শুধুমাত্র একটা মাংসপিণ্ড নজরে আসে, তবে দেখতে হবে যে, ইতোপূর্বে অন্ততঃ ১৫ দিন পাক ছিলো কিনা এবং রক্তস্রাব কমপক্ষে ৩ দিন ৩ রাত জারী থাকে কিনা। যদি এরকম হয় তবে এ অবস্থায় নামাজ রোজা করা যাবে না। আর এ অবস্থা না হলে ঐ রক্তস্রাবকে এন্তেহায়া ধরতে হবে। তাই এ অবস্থায় নামাজ, রোজা কাজা করতে হবে।

৫. ৪০ দিনের আগে নেফাস বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে নামাজ পড়ে নিতে হবে। গোসলের কারণে স্বাস্থ্যহানির প্রবল আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়তে হবে। এ অবস্থায় নামাজ কাজা করা যাবে না।

৬. হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েজ নয়। তবে কোরআন শরীফ যদি অতিরিক্ত কোনো কাপড় বা অন্য কোনো আচ্ছাদনের ভিতরে থাকে তবে স্পর্শ করা জায়েজ আছে।

৭. হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় পরনের কাপড়ের আঁচল বা অন্য কোনো অংশের সাহায্যেও কোরআন শরীফ স্পর্শ করা যাবে না। অবশ্য পরিধানে নেই এমন কোনো পাক কাপড়, রমাল, ওড়না বা জামা দ্বারা কোরআন শরীফ স্পর্শ করা যায়।

৮. হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় কোরআন শরীফের পূর্ণ কোনো আয়াত পাঠ করা যাবে না। কোনো আয়াতের সামান্য কোনো অংশ বা শব্দ উচ্চারণ করা যাবে। আবার ছোট কোনো আয়াতের সমপরিমাণ হয়ে যায় এরকম কোনো বড় আয়াতের অংশও পাঠ করা যাবে না।

৯. হয়েজ ও নেফাস অবস্থায় দোয়া করা জায়েজ। কোরআন শরীফে উল্লিখিত দোয়া পড়াতেও কোনো বাধা নাই। যেমন- রব্বানা আতিনা ফিদদুন্‌ইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওক্কিনা আজাবান্নার, ইহদিনাস্ সিরাতুল মুস্তাকীম, আল্‌হাম্দুলিল্লাহ ইত্যাদি।

১০. এরকম অবস্থায় কোরআন শরীফ পড়ায় এমন কোনো মহিলা ছাত্র-ছাত্রীকে কোরআনের শব্দ বানান করে দিতে পারবে। তবে কোনো আয়াত এক টানে বলে দিতে পারবে না। এক সাথে একটা বা দুইটা শব্দ বলে দিয়ে থেমে থেমে পুরো আয়াত বলে দিতে পারবে।

১১. এ অবস্থায় কলেমা শরীফ পড়া, দরুদ শরীফ পড়া, আল্লাহর জিকির করা, এস্তেগফার পড়া যায়।

এস্তেহযার বিবরণ

এস্তেহযা অবস্থায় নামাজ রোজা কোনোটাই ছাড়া যাবে না। প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে অজু করে নিতে হবে। ইচ্ছা করলে এ অবস্থায় স্বামী-সহবাসও করতে পারবে।

নাপাকীর বিবরণ

নাজাস (নাপাক) দুই প্রকারঃ- ১. নাজাসাতে গলিজা এবং ২. নাজাসাতে খফিফা।

নাজাসাতে গলিজা (বেশী নাপাক)ঃ

যে সকল বস্তু মানুষের শরীর থেকে বের হয়ে গেলে অজু নষ্ট হয় অথবা গোসল ফরজ হয়, ঐ সকল বস্তু নাজাসাতে গলিজা। যেমন- পায়খানা, প্রস্রাব, মনি, মজি, পূঁজ এবং মুখভর্তি বমি। হয়েজ, নেফাস এবং এস্তেহযার রক্তও নাজাসাতে গলিজা। শিশু, বালক-বালিকা যে বয়সেরই হোক তাদের প্রস্রাবও নাজাসাতে গলিজার মধ্যে গণ্য।

শরাব, প্রবাহিত রক্ত, মৃতজন্তু, যে সকল জন্তুর গোশত হালাল নয়- তাদের প্রস্রাব, লাদ, গোবর, কুকুরের মল, হাঁস মোরগের পায়খানাও নাজাসাতে গলিজার অন্তর্ভুক্ত। হিংস্র জানোয়ার, বিড়াল এবং হাঁদুরের পায়খানাও তাই।

নাজাসাতে খফিফা (কম নাপাক)ঃ

ঘোড়ার প্রস্রাব এবং যে সকল পশুর গোশত হালাল যেমন- গরু, ছাগল, উট ইত্যাদির প্রস্রাব নাজাসাতে খফিফা। যে সকল পাখির গোশত হারাম যেমন- বাজ, চিল ইত্যাদির মলও নাজাসাতে খফিফা।

নাজাসাতে গলিজা এক দেরহাম পরিমাণ অপেক্ষা বেশী লাগলে শরীর অথবা কাপড় নাপাক হয়ে যায়। হাতের তালু সোজা করে পানি নিলে যতটুকু পানি তালুতে আটকে যায়— পানির ততটুকু আয়তনকে এক দেরহাম ধরা হয়। নাপাকি জমাট হলে দেরহামের ওজন এবং তরল হলে দেরহামের আয়তন ধর্তব্য।

নাজাসাতে খফিফা কাপড়ের চার ভাগের একভাগ অর্থাৎ একভাগের অধিক জায়গা জুড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হয়ে যায়। শরীরের কোনো অঙ্গের চারভাগের একভাগ বা একভাগের বেশী জায়গায় লাগলে শরীরও নাপাক হয়ে যায়।

পাক নাপাক সম্পর্কে আরো কিছু নিয়ম-কানুন জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমনঃ—

১. পানির সঙ্গে কোনো নাপাক বস্তু মিশে যদি পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদ এই তিনটি গুণই নষ্ট হয়ে যায়— তবে সেই পানি ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এরকম পানি গৃহপালিত পশুকে পান করানো এবং মাটি অথবা চুন স্তরকিতে মিশিয়ে গৃহ নির্মাণের কাজ করানো দুরস্ত (ঠিক) নয়। আর যদি পানির যে কোনো একটি বা দুইটি গুণ নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেই পানি পশুকে পান করানো এবং গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা জায়েজ (বৈধ)। কিন্তু এরকম পানি মিশ্রিত মাটি বা কাদার দ্বারা মসজিদ নির্মাণ বা লেপন দুরস্ত নয়।

২. বৃষ্টির সময় রাস্তাঘাটে বা বাজারে চলতে গেলে যে পানি বা কাদার ছিটা শরীরে ও কাপড়ে লাগে তাকে নাপাক ধরা হয় না। যদি সেই পানি বা কাদার ছিটার মধ্যে কোনো নাপাকি স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তো শরীর বা কাপড় নাপাক হবেই।

৩. সব নাপাকই হারাম। কিন্তু সব পাক বস্তু হালাল নয় বা সকল হারামও পাক নয়।

৪. যে সকল পাখির গোশত্ হালাল, তাদের মল পাক। যেমন— কবুতর, চড়ুই ইত্যাদি।

৫. মশা, মাছি এবং ছারপোকাকার রক্ত পাক। যদিও তা পরিমাণে অনেক হয়।

৬. যদি নাপাক তেল এক দেরহামের কম পরিমাণ কাপড়ে পড়ে এবং পরে তা এক দেরহামের বেশী স্থান জুড়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, তখন আর ঐ কাপড় পরে নামাজ হয় না।

৭. ভেজা নাপাক কাপড়ের সঙ্গে শুকনা পাক কাপড় জড়িয়ে রাখলে পাক কাপড়টি যতক্ষণ না এরকম ভিজে যায় যাতে নিংড়ালে পানির ফোটা পড়ে না, এরকম অবস্থায় পাক কাপড়টি পাকই থাকবে। এর বেশী হলে নাপাক হয়ে যাবে।

৮. যদি শুকনা পা ভেজা নাপাক কাপড়ের উপরে রাখলে পা ভিজে যায় তবে, পা নাপাক হয়ে যাবে।

৯. দুর্গন্ধ বাতাস ভেজা পাক কাপড়ে লাগলে, কাপড় থেকে যদি নাপাকির গন্ধ বের হতে থাকে, তবে ঐ কাপড় নাপাক হয়ে যাবে।

১০. নাজাসাত থেকে যে বাষ্প ওঠে তা পাক। ফলের মধ্যে যে পোকা জন্মে তা নাপাক নয়। কিন্তু ফলের সঙ্গে ঐ সকল পোকা খাওয়া জায়েজ নয়।

১১. ঘুমের সময় মানুষের মুখ থেকে যে লালা নির্গত হয়, তা নাপাক নয়।

১২. খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলেও তা নাপাক হয় না।

১৩. যে পানি দ্বারা নাপাক জিনিস ধোয়া হয়, সে পানি নাপাক।

১৪. যে পানিতে মৃত মানুষকে গোসল করানো হয় তা নাপাক।

১৫. মৃত ব্যক্তির মুখের লালা নাপাক।

১৬. যে পানি অজুর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, সেই পানি পান করা, খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহার করা, কিংবা অজু গোসল করা দুরস্ত নয়। তবে ঐ পানি দিয়ে কোনো নাপাক জিনিস ধোয়া যায়।

১৭. নাপাক তেল বা চর্বি দ্বারা তৈরী সাবান পাক।

১৮. শরীরে, কাপড়ে, চুলে বা দাড়িতে যদি নাপাক রং লাগে, তবে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। যখন রংহীন সাদা পানি বের হবে, তখন শরীর, কাপড়, চুল, দাড়ি পাক হয়ে যাবে, যদিও রংয়ের চিহ্ন দূর না হয়।

১৯. নাপাক তেল, চর্বি বা ঘি যদি কোনো বস্তুতে লাগে এবং তা ধুয়ে ফেলার পর যখন পরিষ্কার পানি বের হতে থাকে, তখন তাকে পাক ধরতে হবে যদিও তাতে তৈলাক্ত ভাব অবশিষ্ট থাকে।

২০. মুরগী বা হালাল কোনো জীব জবেহ করে পেট সাফ করার আগেই যদি গরম পানিতে সিদ্ধ করা হয়, তবে তা নাপাক ও হারাম হয়ে যায়। তা পাক করার আর কোনো উপায়ই তখন অবশিষ্ট থাকে না।

২১. পানিতে নাজাসাত পড়লে সে পানিও নাপাক হয়ে যায়। নাজাসাত বেশী হোক বা কম হোক। যদি স্রোতের পানি হয় এবং সে পানিতে নাজাসাত পড়ার কারণে যদি পানির বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তিত না হয় তবে পানি নাপাক হয় না। আর বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ নষ্ট হয়ে গেলে সে পানির দ্বারা অজু গোসল দুরস্ত হয় না। যে পানি প্রবাহ ঘাস-লতা-পাতা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাকে স্রোতের পানি বলে।

২২. কমপক্ষে ১০০ বর্গহাত আয়তন বিশিষ্ট কোনো হাউজ বা পুকুরের গভীরতা যদি এরকম হয় যে, তা থেকে আঁজলা ভরে পানি তুলতে গেলে পানির নীচের মাটি দৃষ্টিগোচর হয় না— সে হাউজ বা পুকুরও স্রোতের পানি হিসাবে গণ্য। এরকম হাউজ বা পুকুরের পানির বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ নাপাকি পড়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেলে সে পানিতেও অজু গোসল দুরস্ত হয় না।

২৩. উপরোক্ত আয়তন বিশিষ্ট অথবা তদপেক্ষা বড় হাউজ বা পুকুরের পানিতে অজুর ব্যবহৃত পানি পড়লেও পানি নাপাক হিসাবে গণ্য হয় না।

২৪. মশা, মাছি, বোলতা, ভীমরুল ইত্যাদি যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবহমান রক্ত নাই, সে সকল প্রাণী পানিতে মরে পড়ে থাকলে অথবা বাহিরে মরে পানিতে এসে পড়লে পানি নাপাক হয় না।

২৫. পানিতেই যে সকল প্রাণীর জন্ম, সে সকল প্রাণী পানিতে মরে পড়ে থাকলে পানি নাপাক হয় না। যেমন- মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি।

২৬. ব্যাঙ বা কচ্ছপ পানিতে মরে যদি পঁচে গলে পানির সাথে মিশেও যায়, তবুও পানি নাপাক হয় না। তবে এরকম পানি পান করা দূরস্ত নয়। কিন্তু অজু গোসল করাতে কোনো দোষ নেই।

২৭. শুকরের চামড়া কোনো অবস্থাতেই পাক নয়। অন্যান্য জন্তুর চামড়া পাকা করলে পাক হিসাবে গণ্য হয়।

২৮. শুকর ছাড়া অন্যান্য মৃত জন্তুর শিং, হাড় ও দাঁত পাক। মানুষের হাড় ও চুল পাক।

২৯. বেদ্বীন হোক, ঋতুবতী, নেফাসওয়ালী বা যে কোনো নাপাক মানুষ হোক সব রকম মানুষের বুটা পাক। তাদের ঘামও পাক। তবে মুখে বা শরীরে যদি অন্য কোনো নাপাকি লেগে থাকে তবে তাদের বুটা নাপাক হয়ে যায়।

৩০. যে সকল জন্তুর বুটা নাপাক, তাদের ঘামও নাপাক। যাদের বুটা পাক, তাদের ঘামও পাক। যাদের বুটা মাকরুহ, তাদের ঘামও মাকরুহ।

৩১. কুকুরের বুটা নাপাক। কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা নাপাক হয়ে যায়। ঐ পাত্র তিনবার ধুয়ে নিলে পাক হয়ে যায়। কিন্তু সাতবার ধোয়া ভালো। একবার মাটি দিয়ে মেজে ফেলা আরো বেশী ভালো।

৩২. শুকরের বুটা নাপাক। বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, শৃগাল ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর বুটা নাপাক।

৩৩. বিড়ালের বুটা পাক। কিন্তু মাকরুহ।

৩৪. যে মুরগীকে বেঁধে রাখা হয়, তার বুটা পাক। যে মুরগী এদিক ওদিক ঘুরে এটা ওটা খেয়ে বেড়ায়, তার বুটা মাকরুহ।

৩৫. হালাল পশু, যেমন- ভেড়া, বকরী, গরু, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি এবং হালাল পাখি যেমন- ময়না, তোতা, ঘুঘু, চড়ুই ইত্যাদি প্রাণীর বুটা পাক। ঘোড়ার বুটাও পাক।

৩৬. সাপ, বিছু, ইঁদুর, টিকটিকি এসবের বুটা মাকরুহ।

৩৭. হুঁদুর রুটির কিছু অংশ খেয়ে ফেললে সেইদিক থেকে কিছু অংশ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ খাওয়া যায়।

৩৮. মেয়েদের জন্য নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের বুটা খাদ্য অথবা পানি খাওয়া মাকরুহ। একইভাবে পুরুষের জন্য নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীলোকের বুটা খাওয়া মাকরুহ। না জেনে খেলে মাকরুহ নয়।

৩৯. বিছানার এক অংশ নাপাক থাকলে অপর অংশের উপর নামাজ পড়া যায়।

৪০. শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে পাক জিনিস নাপাক হয় না।

৪১. সূচের অগ্রভাগের পরিমাণ প্রস্রাবের ছিটা নাপাক নয়।

নাপাকি দূর করার নিয়ম

১. যে তরল নাপাকি শুকিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যায় না, যেমন- শরাব, প্রস্রাব ইত্যাদি। এরকম নাপাকি শরীরে লাগলে তিনবার ধুয়ে নিতে হবে। কাপড়ে লাগলেও তিনবার ধুয়ে নিতে হবে। প্রতিবার ধোয়ার পর কাপড় নিংড়িয়ে নিতে হবে। তৃতীয়বার যথাসম্ভব জোরে নিংড়িয়ে নিতে হবে।

২. যে সকল বস্তু নিংড়ানো যায় না, যেমন- চাটাই, তোষক, পাটি, বিছানা ইত্যাদি। এসব বস্তুও তিনবার ধুয়ে নিতে হবে। প্রতিবার ধুয়ে পানির ফোঁটা পড়া শেষ হবার পর ঐ বস্তুটি পাক হয়ে যাবে।

৩. নাপাকী মিশ্রিত তরল কোনো বস্তুর দাগ উঠিয়ে ফেলা যদি কষ্টকর হয়, যেমন- মেহেদির রং, তেল ইত্যাদি। এরকম অবস্থায় তিনবার ধুয়ে ফেললেই নাপাক মিশ্রিত বস্তু পাক হয়ে যাবে যদিও দাগ অবশিষ্ট থাকে।

৪. জুতা স্যাঙেলে গোবর, গলিজ ইত্যাদি জমাট কোনো নাপাকি লাগলে জমিনে ঘষে সে নাপাকি তুলে ফেলতে হবে। তাতেই জুতা স্যাঙেল পাক হয়ে যাবে। আর প্রস্রাব ইত্যাদি তরল ধরনের নাপাকি লাগলে পানিতে ধুয়ে পাক করে নিতে হবে।

৫. কাপড়, শরীর বা অন্য কোনো জিনিসে শুকনা বা তরল মনি লাগলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে পাক করে নিতে হবে। শুকনা মনি ঘষে ফেললেও তা পাক হয়ে যায়।

৬. মাটি ও ইটের বিছানায় তরল কোনো নাপাকি পড়ে শুকিয়ে গেলে যদি নাপাকির চিহ্ন দূর হয়ে যায়, তবে তার উপর নামাজ পড়া যাবে। কিন্তু ঐ মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে না।

৭. একখানা কাপড়ের কোনো অংশে নাপাকি লেগেছে। পরে যদি ঠিক কোন অংশে লেগেছে সে কথা মনে না থাকে। তখন কাপড়ের যে কোনো অংশ ধুয়ে ফেললেই ঐ কাপড়কে পাক বলা যাবে।

৮. ঘরের মেঝে যদি প্রস্রাব লেগে নাপাক হয়ে যায়, তখন কাঁচা মেঝে হলে মেঝের উপর দিয়ে তিনবার পানি প্রবাহিত করে দিলে মেঝে পাক হয়ে যাবে। আর যদি পাকা মেঝে হয়, তবে পানি ঢেলে দিয়ে হাত দিয়ে মালিশ করবার পর পাক কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। এরকম তিনবার করলে মেঝে পাক হয়ে যাবে।

৯. লোহা নির্মিত বস্তু এবং আয়না ইত্যাদি যা নাপাকি চুষে নিতে পারে না, এরকম বস্তু কাপড় দিয়ে মুছে ফেললে পাক হয়ে যায়।

১০. যদি মনি শরীরে লাগে, তবে ধোয়া ব্যতীত শরীর পাক হয় না।

পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে আরো ৫টি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে। সে পাঁচটি কাজকে জরুরী সুনুত হিসাবে মনে করতে হবে।

১. **খত্না করাঃ** প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ হওয়ার পূর্বেই এই গুরুত্বপূর্ণ সুনুত কাজটি করতে হয়। নাহলে পরবর্তী জীবনে পদে পদে পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়। খত্না ইসলামের বিশেষ বিধান।

২. **নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করাঃ** নাভির নীচের যৌনকেশ বেশি বড় হওয়ার আগেই কামিয়ে ফেলা সুনুত। কেটে ছেঁটে রাখা মোস্তাহাব। যৌনকেশ কামিয়ে ফেলা পুরুষ নারী সবারই জন্য সুনুত। চল্লিশ দিনের মধ্যেই এই কাজ করতে হবে। এর কম সময়ের মধ্যে করলে আরো ভালো।

৩. **হাত ও পায়ের নখ কাটাঃ** সময়মতো হাত ও পায়ের নখ কেটে ফেলতে হবে। হাত ও পায়ের আঙ্গুলের সঙ্গে মিলিত অংশকে বাদ দিয়ে নখের বাড়তি অংশ কাটতে হবে। এ ব্যাপারে নারী পুরুষের একই বিধান। এর সময়সীমা নিজেদেরকেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। তবে প্রতি সপ্তাহে নখ কাটতে পারলে ভালো। প্রথমে ডান হাতের তারপর বাম হাতের এবং প্রথমে ডান পায়ের এবং পরে বাম পায়ের নখ কাটা সুনুত।

৪. **গোঁফ কাটাঃ** গোঁফ ছোট করে ছেঁটে রাখা সুনুত। ক্ষুর অথবা ব্লেড দিয়ে কামিয়েও ফেলা যায়। এই কাজ প্রতি সপ্তাহেই করা উচিত। নেককার লোকগণ সাধারণতঃ জুমআর দিনে এই কাজ করে থাকেন।

৫. **দাড়ি রাখাঃ** প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ি রাখা সুনুত। এক মুষ্টির বেশি দাড়ি ছেঁটে ফেলা যায়। দাড়ি এক মুষ্টির পরিমাণের চেয়ে ছোট করে ছেঁটে ফেললে তাকে দাড়ি রাখা বলা যাবে না। বাতিল মওদুদী মতবাদের অনুসারী এবং বেদাতী লোকেরা সাধারণতঃ একমুষ্টির কম পরিমাণ ছেঁটে দাড়ি রাখতে অভ্যস্ত। একমুষ্টি পরিমাণের কম দাড়ি রাখতে অভ্যস্ত ব্যক্তির ইমামতিতে নামাজ পড়া জায়েয নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরীয়তের দলিল

আমরা আল্লাহুতায়ালার বান্দা। আল্লাহুতায়ালার আদেশ নিষেধ আমাদেরকে পালন করতেই হয়। এ সকল আদেশ নিষেধ জানবার সূত্র চারটি। যেমন—কোরআন, হাদিস, এজমা এবং কেয়াস।

১. আল্লাহুতায়ালার যে সকল বাক্য (কালাম) অহি মারফত শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স. এর প্রতি নাজিল করেছেন তারই একত্রিতরূপ কোরআন শরীফ।

২. যে সকল কাজ রসূলে পাক স. নিজে করেছেন, অন্যকে করতে বলেছেন অথবা অন্য কাউকে করতে দেখে পছন্দ করেছেন সে সকলই হাদিস।

৩. কোরআন ও হাদিসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা যে সকল বিষয়ের উপর শরীয়তের ইমামগণ একমত হয়েছেন— তার নাম এজমা।

৪. আর যে সকল বিষয় কোরআন, হাদিস এবং এজমার মাধ্যমে সমাধান করা যায় না, সে সকল বিষয়ে কোরআন হাদিস এবং এজমার ভিত্তিতে মুজতাহিদ ইমামগণ সমাধান দিয়ে থাকেন। এর নাম কেয়াস।

শরীয়ত এবং তরিকতের নির্দেশাদি উপরোক্ত সূত্রসমূহের মাধ্যমে অবশ্যই প্রমাণিত হতে হবে। এর বাইরে যা কিছু আছে সমস্তই বেদ'আত (নতুনত্ব)। আর বেদ'আত মানেই পথভ্রষ্টতা। একথা ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

উপর্যুক্ত সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত শরীয়তের নির্দেশাদি ৯ প্রকার। একে একে সে সমস্তের বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

১. ফরজঃ

যে সকল কাজ করতে আল্লাহুপাক সরাসরি নির্দেশ প্রদান করেছেন, সে সকল কাজ ফরজ। ফরজ কাজ যে করে না তাকে দুনিয়ায় ফাসেক বলা হয়। আর আখেরাতে তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

ফরজ কাজ দুই ধরনের। যেমন—

(ক) ফরজে আইন— যেমন কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত। ওয়াদা পালন করা, আমানত রক্ষা করা, সত্যকথা বলা, হালাল খাদ্য খাওয়া ইত্যাদি।

(খ) ফরজে কেফায়া— যেমন জানাজার নামাজ পড়া, কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

২. ওয়াজিবঃ

ওয়াজিব ফরজের মতোই। ফরজ আদায় না করলে যেমন গোনাহ্ হয় এবং শাস্তির উপযুক্ত হয়— ওয়াজিব আদায় না করলেও তেমনি গোনাহ্ হয় এবং শাস্তিযোগ্য হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ফরজ অস্বীকার করলে কাফের হয় আর ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হয় না, ফাছেক হয়।

৩. সুন্নতঃ

রসূলে পাক স. এবং তাঁর সাহাবীগণ রা. যেরকমভাবে আমল করতেন, তাকেই সুন্নত বলে।

সুন্নত দুই রকমের—

(ক) সুন্নতে মোয়াক্কাদাঃ যে সকল কাজ রসূলে পাক স. এবং তাঁর সাহাবাগণ রা. কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া সব সময় করতেন— সেই কাজগুলোকেই সুন্নতে মোয়াক্কাদা বলে। যেমন— আজান, একামত, ফজরের নামাজের আগের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ ইত্যাদি। সুন্নতে মোয়াক্কাদার গুরুত্ব ওয়াজিবেরই মতো। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বিশেষ কারণ বশতঃ ওয়াজিব বাদ পড়লে পরে তার কাজা আদায় করে নিতে হয়। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে সুন্নতে মোয়াক্কাদা বাদ পড়লে তার কাজা আদায় করতে হয় না। বিনা কারণে সুন্নতে মোয়াক্কাদা বাদ দিতে যারা অভ্যস্ত তারা ফাছেক ও গোনাহ্গার এবং রসূলে পাক স. এর খাস শাফায়াত থেকে বঞ্চিত।

(খ) সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদাঃ যে সকল আমল কোনো কারণ ছাড়াও রসূলেপাক স. এবং তাঁর সাহাবীগণ রা. মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন সেগুলো সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা। সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা আমল করলে ছওয়াব পাওয়া যায়। না করলে গোনাহ্ হয় না।

৪. মোস্তাহাবঃ

যে সকল কাজ রসূলে পাক স. এবং তাঁর সাহাবীগণ রা. কখনো কখনো করতেন, অধিকাংশ সময়ই করতেন না— সে সকল আমলই মোস্তাহাব আমল। মোস্তাহাব আমল করলে ছওয়াব আছে। না করলে গোনাহ্ নেই। মোস্তাহাবকে নফলও বলা যায়।

নামাজের নিয়ম/৩০

৫. হারামঃ

ফরজের বিপরীত কাজ হারাম। যে ব্যক্তি হারামকে অস্বীকার করে অথবা হারাম (নিষেধ) কে হালাল (বৈধ) মনে করে সে ব্যক্তি কাফের। যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম কাজে লিপ্ত কোনো ব্যক্তি হারামকে হারাম হিসাবে স্বীকার করবে ততক্ষণ সে কাফের হবে না, ফাসেক হবে এবং শাস্তির যোগ্য হবে। হারাম কাজ যেমন, গুয়ার খাওয়া, শরাব পান করা, নামাজ না পড়া, হারাম উপায়ে রোজগার করা, আমানত রক্ষা না করা ইত্যাদি।

৬. মাকরুহ্ তাহরিমীঃ

মাকরুহ্ তাহরিমী ওয়াজিবের বিপরীত। এর অস্বীকারকারীরা কাফের নয়, ফাসেক। উপযুক্ত কোনো শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া মাকরুহ্ তাহরিমী আমলকারীরা আজাবের যোগ্য।

৭. মাকরুহ্ তানযিহীঃ

মাকরুহ্ তানযিহী পালন না করলে ছওয়াব আছে, করলে গোনাহ্ নেই।

৮. মোবাহ্ঃ

মোবাহ্ কাজে আল্লাহ্‌তায়ালার মানুষকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। মানুষ ইচ্ছা করলে মোবাহ্ কাজ করতেও পারে, ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। একাজ পালন করলে ছওয়াবও নেই। ছেড়ে দিলে গোনাহ্ও নেই। মোবাহ্ কাজ যেমন পানাহার করা, কৃষিকাজ করা, ব্যবসা করা, দেশ ভ্রমণ করা ইত্যাদি।

৯. বেদাতঃ

রসূলে পাক স. এবং তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণ রা. যা করেননি এবং যে সকল কাজের সঙ্গে কোনো প্রকার পরোক্ষ বা দূরবর্তী কোনো সংশ্রবও কোরআন হাদিস থেকে পাওয়া যায় না, সে সকলই বেদাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মাজার পূজা করা, পীর পূজা করা, জরুরী মনে করে মৃত ব্যক্তির জন্য চল্লিশা করা ইত্যাদি। রসূলে পাক স. এর সম্মানিত সাহাবীগণের নিন্দা করাও বেদাত। যেমন— শিয়া এবং মওদুদী মতবাদের লোকেরা করে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

নামাজের সময়

দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। নির্ধারিত সময়ের আগে পড়লে নামাজ হবে না। আর নির্ধারিত সময়ের পরে পড়লে নামাজ কাজা হয়ে যাবে। শরীয়তসম্মত ওজর (কারণ) ছাড়া নামাজ কাজা করা ভয়ানক গোনাহের কাজ। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেনঃ

নিশ্চয় মোমেনগণের উপর নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা ফরজ। (সূরা নেসা)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নাম— ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব এবং এশা। এখন একে একে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছেঃ—

ফজরঃ

রাত্রিশেষে যখন পূর্ব আকাশে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত সাদা রেখা দেখা যায় ঐ সময়কে সোবহে সাদেক বলে। ঐ সময় থেকে সূর্যোদয় শুরু পূর্ব সময় পর্যন্ত ফজরের নামাজের সময়।

দিন-রাত্রির ছোট-বড় অনুপাতে এই সময়সীমা কখনো কমে আবার কখনো বাড়ে। সাধারণতঃ ১ ঘন্টার বেশী সময় জুড়ে ফজরের নামাজের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে। সম্পূর্ণ সময়কে সমান দুই অংশে ভাগ করে প্রথম অংশে মেয়েদের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে পুরুষদের জন্য নামাজ পড়া উত্তম। নামাজ পড়তে পড়তেই যদি সূর্যোদয় শুরু হয় তবে নামাজ হবে না।

ফজরের নামাজে প্রথমে দুই রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ পড়ে নিতে হয়। তারপর দুই রাকাত ফরজ পড়তে হয়।

জোহর এবং জুমআঃ

দ্বিপ্রহরের পর থেকে জোহর এবং জুমআ নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কোনো বস্তুর ছায়া আছলী (মূল ছায়া যা ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় থাকে) বাদে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের নামাজের সময় থাকে।

শীতকালে ওয়াক্তের প্রথম দিকে এবং গ্রীষ্মকালে কিছু দেৱী করে ওয়াক্তের মধ্যভাগে জোহর নামাজ পড়া মোস্তাহাব। বছরের সব সময় ওয়াক্তের প্রথম দিকে জুমআ নামাজ পড়া সুন্নত।

জোহর নামাজ পড়তে পড়তে যদি আছর নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায় তবে নামাজ হবে না। তখন জোহরের কাজা নামাজ পড়তে হবে।

আসরঃ

জোহরের সময় শেষ হবার পর থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর কিছু বিলম্বে আসর নামাজ পড়া মোস্তাহাব। কিন্তু যখন সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় উপস্থিত হয় এবং সূর্য নিঃপ্রভ হয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করে তখন আসর নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী। তবুও যদি কখনো এরকম সময় উপস্থিত হয়, তবে নামাজ কাজা না করে, পড়ে নিতে হবে। নামাজ পড়তে পড়তে সূর্য ডুবে গেলেও নামাজ হয়ে যাবে।

মাগরিবঃ

সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। লাল আভা বিলীন হবার পর যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম আকাশের উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত সাদা আভা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের নামাজের সময় থাকে। প্রতিদিন ফজর এবং মাগরিবের নামাজের সময়সীমা সমান সমান হয়ে থাকে। ওয়াক্তের প্রথম দিকে মাগরিবের নামাজ আদায় করা মোস্তাহাব। বিনা কারণে বিলম্ব করা মাকরুহ তাহরিমী।

মাগরিবের ফরজ নামাজ পড়তে পড়তে এশার নামাজ শুরু হয়ে গেলেও নামাজ হয়ে যাবে।

এশাঃ

মাগরিবের পর থেকে সোবহে সাদেক পর্যন্ত এশার নামাজের সময়। রাতের এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা করে এশার নামাজ পড়া মোস্তাহাব। বিনা কারণে মধ্যরাত্রির পর এশার নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী।

এশার নামাজ পড়তে পড়তে সোবহে সাদেক হয়ে গেলেও এশার নামাজ হয়ে যায়।

নামাজের নিষিদ্ধ সময়

সূর্যোদয়ের সময়, ঠিক দ্বিপ্রহরে এবং সূর্যাস্তের অবস্থায়— এই তিন সময়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ। এই সময় ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব, কাজা— কোনো প্রকার নামাজই পড়া যাবে না। ঐ সময় সেজদা এবং তেলাওয়াতের সেজদাও করা যাবে না।

নামাজের মাকরুহ সময়

১. সোবহে সাদেকের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত শুধু দুই রাকাত সুন্নত এবং দুই রাকাত ফরজ ব্যতীত কোনো প্রকার নফল নামাজ পড়া যাবে না। এরকম করা মাকরুহ তাহরিমী।

২. ফজরের দুই রাকাত ফরজের আগে সুন্নত না পড়ে থাকলে সূর্যোদয়ের পর ঐ সুন্নত নামাজ পড়তে হবে।

৩. আসর নামাজের পর থেকে মাগরিব নামাজ পর্যন্ত কোনো প্রকার নফল নামাজ পড়া যাবে না।

৪. নামাজ শুরু হয়ে গেলে সুন্নত এবং নফল নামাজ পড়া মাকরুহ।

৫. জুমআর দিন যে সময় ইমাম খোতবার জন্য দাঁড়িয়ে যান, সে সময় থেকে জুমআর ফরজ নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সুন্নত বা নফল পড়া মাকরুহ।

৬. ঈদের দিন ঈদের নামাজের আগে বাড়ীতে অথবা ঈদগাহে নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। ঈদের নামাজ শেষে তৎক্ষণাৎ ঈদগাহে নামাজ পড়া মাকরুহ।

৭. পেশাব, পায়খানা কিংবা বায়ু নিঃসরণের বেগ নিয়ে নামাজ পড়া মাকরুহ। খাবার প্রস্তুত থাকলে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের জন্য খাওয়া শেষ করে নামাজ পড়া উত্তম। ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামাজ পড়া মাকরুহ।

নামাজের সময় সম্পর্কে শেষ কথা

নামাজের সময় সম্পর্কে একটি চিরস্থায়ী সময়সূচী প্রস্তুত করেছেন হজরত মওলানা মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ আমীমুল ইহসান মোজাদ্দি বারাকাতী (রহঃ)। প্রত্যেকের নিকট এই সময়সূচী থাকা প্রয়োজন। তা'হলে নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে আমাদেরকে কখনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব পড়তে হবে না। সবার সুবিধার জন্য এই বইয়ের শেষে ঐ সময়সূচী সংযুক্ত করে দেয়া হলো। আল্লাহপাক মরহুম মুফতী হুজুর (রহঃ) কে এর জন্য জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

আযান এবং একামত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

১. পুরুষদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমআর নামাজের আযান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

২. নফল, ঈদ ও জানাযার নামাজের জন্য আযানের বিধান নেই।

৩. নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে আযান দেয়া সুন্নত। নামাজের পূর্বক্ষণে বা পরক্ষণে আযান দেয়া সুন্নত নয়।

৪. সময় হওয়ার আগেই আযান দিয়ে ফেললে পুনরায় আযান দিতে হবে।

আযানের নিয়ম

অজু করে পাক জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে হবে। কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং দুই কানের ছিদ্রদেশে দুই হাতের দুই শাহাদত আঙ্গুল (তর্জানী) প্রবেশ করিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে নীচের বাক্যগুলি উচ্চারণ করতে হবে।

- আল্লাহু আকবর - মোট চারবার
- আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু - দুইবার
- আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহু - দুইবার
- হাইয়্যা আ'লাস্ সলাহু - দুইবার
- হাইয়্যা আ'লাল্ ফালাহু - দুইবার
- আল্লাহু আকবর - দুইবার
- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু - একবার

জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সব নামাজের ওয়াক্ত হলে উপর্যুক্ত বাক্যগুলোই উচ্চস্বরে ঘোষণা করে আযান দিতে হবে। শুধু ফজরের আযানে হাইয়্যা আ'লাল্ ফালাহু বলার পর দুইবার- 'আস্‌সালাতু খইরুম মিনান্নাউম' বলতে হবে।

২. অজু অবস্থায় আযান দেয়া ভালো। বিনা অজুতেও আযান দেয়া যায়।

৩. যারা আযান শুনবে তাদেরকে মোয়াজ্জিনের আযানের জবাব দিতে হবে। মোয়াজ্জিন যখন যে বাক্য উচ্চারণ করেন, জবাবে ঐ বাক্যই উচ্চারণ করতে হয়। তবে হাইয়্যা আ'লাস্ সলাহু এবং হাইয়্যা আ'লাল্ ফালাহু শোনার পর জবাবে লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাহু বিল্লাহু বলতে হয়। আর ফজরের আযানে যখন আস্‌সালাতু খইরুম মিনান্নাউম উচ্চারিত হয় তখন বলতে হয় সাদাক্বতা ওয়া বাররতা।

৪. জুনুব ব্যক্তি (যার উপর গোসল ফরজ হয়েছে), স্ত্রীলোক, মাতাল, পাগল এবং বোধশক্তিহীন বালকের আযান মাকরুহ তাহরিমী। এরা আযান দিলে পুনরায় শুদ্ধ নিয়মে আযান দেওয়া মোস্তাহাব।

৫. হাইয়্যা আ'লাস্ সলাহু বলার সময় ডান দিকে মুখ ঘোরাতে হবে এবং হাইয়্যা আ'লাল্ ফালাহু বলার সময় বাম দিকে মুখ ঘোরাতে হবে। কিন্তু সীনা কেবলা বরাবর সোজা রাখতে হবে।

৬. গানের মতো সুর করে বা অনর্থক গলার আওয়াজ উঁচু নীচু করে আযান দেয়া ভালো নয়। আযানের উদ্দেশ্য মানুষকে নামাজের জন্য আহ্বান করা। তাই আযান স্পষ্ট এবং সুমিষ্ট উচ্চস্বরে সঠিক উচ্চারণে হওয়া উচিত।

৭. জুমআর ছানি আযান অপেক্ষাকৃত কম আওয়াজে দিতে হবে। কারণ ছানি (দ্বিতীয়) আযানের উদ্দেশ্য উপস্থিত নামাজীগণকে সতর্ক করা।

৮. আট রকম অবস্থায় আযানের জবাব দেয়া উচিত নয়। (১) নামাজ পাঠকালে। (২) খোতবা শোনার সময়। (৩) স্ত্রী সহবাসের সময়। (৪) খানা খাওয়ার সময়। (৫) দ্বিনী এলেম বা শরীয়তের মাসলা মাসায়েল শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়ার সময়। (৬) হায়েজ অবস্থায়। (৭) পেশাব পায়খানার সময়। (৮) নেফাস অবস্থায়।

৯. আযানের সময় সালাম দেওয়া এবং সালামের জবাব দেওয়া নিষেধ।

১০. আযানের পর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করতে হয়।

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدَنَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودَنَ الَّذِي وَعَدْتَهُ- إِنَّكَ لَا تُلَاِفُ
الْمِيعَادِ -

একামত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

১. আযানের বাক্যগুলোই একামতে উচ্চারণ করতে হয় এবং তৎসহ ক্বাদকামাতিস্ সলাহ্ বাক্যটি হাইআ'লাল্ ফালাহ্'র পরে দুইবার উচ্চারণ করতে হয়। একামতের বাক্যগুলো পৃথক পৃথক ভাবে বলতে হবে, সুর করে একামত বলা উচিত নয়।

২. একামতের জবাব দেওয়া মোস্তাহাব। ক্বাদকামাতিস্ সলাহ্'র জবাবে বলতে হবে আক্বামাল্লাহ্ ওয়া আদামাহা।

৩. একামতের সময় কানের ছিদ্র বন্ধ করার দরকার নেই। হাইয়্যা আ'লাস্ সলাহ্ এবং হাইয়্যা আ'লাল্ ফালাহ্ বলার সময় ডানে বামে মুখ ফেরাবারও দরকার নেই।

৪. উপস্থিত নামাজীরা যাতে শুনতে পায়— এরকম আওয়াজেই একামত দেয়া যায়। আযানের মতো উচ্চকণ্ঠ হবার দরকার নেই।

৫. একামতে হাইয়্যা আ'লাস্ সলাহ্ বলার সময় নামাজীগণকে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। ক্বাদকামাতিস্ সলাহ্ বললে ইমাম নামাজ শুরু করতে পারবেন। একামতের আগেই নামাজীগণ এবং ইমাম নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। বরং কাতার সোজা করার জন্য আগে দাঁড়ানোই ভালো।

৬. আযানদাতাই একামত বলবেন। তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে অন্য কেউ একামত বলতে পারবেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে অন্য কেউ একামত বললে মাকরুহ্ হবে।

নামাজের নিয়ম/৩৬

নামাজ কয় রাকাত পড়তে হবে

দিনে রাতে মোট ১৭ রাকাত নামাজ ফরজ। প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ-

১. ফজর	-	২ রাকাত
২. জোহর	-	৪ রাকাত
৩. আসর	-	৪ রাকাত
৪. মাগরিব	-	৩ রাকাত
৫. এশা	-	৪ রাকাত
মোট		১৭ রাকাত।

জুমআর দিনে ১৫ রাকাত ফরজ নামাজ পড়তে হয়। কারণ ঐ দিন জোহরের নামাজের বদলে জুমআ দুই রাকাত পড়তে হয়।

ওয়াজিব নামাজ তিন ধরনের। ১. বিতির নামাজ- ৩ রাকাত, প্রতিদিন এশার নামাজের পর পড়তে হয়। ২. ঈদুল ফিতরের নামাজ। ৩. ঈদুল আজহার নামাজ। ফরজ এবং ওয়াজিব নামাজ ছাড়া আর সকল নামাজ নফল। সুন্নতে মোয়াক্কাদা, গায়ের মোয়াক্কাদা অথবা মোস্তাহাব সবই নফলের পর্যায়ভুক্ত। (হাদিয়াতুল মুসল্লিন)।

সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ প্রতিদিনে ও রাতে ১২ রাকাত পড়তে হয়। ওয়াক্ত হিসাবে সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজের বিবরণ নীচে দেয়া হলো-

১. ফজরের ফরজ নামাজের আগে	২ রাকাত
২. জোহরের ফরজ নামাজের আগে	৪ রাকাত
এবং পরে	২ রাকাত
৩. মাগরিবের ফরজ নামাজের পরে	২ রাকাত
৪. এশার ফরজ নামাজের পরে	২ রাকাত
মোট - ১২ রাকাত	

জুমআর নামাজের আগে ৪ রাকাত এবং পরে ৪ রাকাত এবং ২ রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ পড়তে হয়।

সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা নামাজ দিনে রাতে ইচ্ছা করলে ১০ রাকাত পড়া যায়।	
আসরের ফরজের আগে	৪ রাকাত
এবং এশার ফরজের আগে	৪ রাকাত
বিতিরের পর	২ রাকাত
মোট	- ১০ রাকাত

বিতিরের পর যে ২ রাকাত পড়তে হয় সেই দুই রাকাত নামাজ বসে পড়া সুন্নত।

সুনতে গায়ের মোয়াক্কাদা নামাজ আরো আছে। যেমন—

১. হজ্ব বা ওমরার সময় ও এহরাম বাঁধবার আগে ২ রাকাত।
২. সূর্য গ্রহণের সময় ২ রাকাত
৩. চন্দ্র গ্রহণের সময় ২ রাকাত

নামাজের পূর্বশর্ত

নামাজ শুরু করার পূর্বে ৭টি ফরজ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। সেগুলো হচ্ছেঃ

১. শরীর পাক করা ২. কাপড় পাক রাখা ৩. নামাজের স্থান পাক হওয়া ৪. সতর আবৃত রাখা ৫. কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ৬. নিয়ত করা ৭. ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়া।

এই ফরজগুলো সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১. শরীর পাক করাঃ

অজুর প্রয়োজন হলে অজু করতে হবে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল সেরে নিতে হবে। শরীয়তসম্মত কারণে অজু-গোসল করতে সক্ষম না হলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে। অজু, গোসল এবং তায়াম্মুম সম্পর্কে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী বিষয় জেনে রাখা উচিত। যেমন—

ক. অনেকের শরীর দুর্বল। রাতে গোসল করলে তাদের সর্দি কাশি বা অন্য কোনো রকম শারীরিক ক্ষতি হয়। এ ধরনের কেউ কেউ সহবাসজনিত বা অন্য কোনো কারণে নাপাক হলে শরীর খারাপের ভয়ে গোসল করেন না এবং ফজরের নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেন এবং দিনের বেলা গোসল করে কাজা নামাজ আদায় করেন। এরকম করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়া আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম। আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। জানা উচিত ওজরবশতঃ তায়াম্মুম অজু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত। এমতাবস্থায়, তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নেয়া উচিত। নামাজ ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

খ. সুনত তরিকা অনুযায়ী গোসল করলে যদি শরীর অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে তবে শুধু ফরজগুলো আদায় করে নিলেই গোসল হয়ে যাবে। যেমন— একবার গড়গড়া করে কুলি করে নাকে ভালোভাবে পানি দিয়ে শরীরের প্রতিটি লোম সম্পূর্ণ ভিজে যায়, এভাবে সারা শরীরে একবার পানি বইয়ে দিলেই গোসল হয়ে যাবে। গোসলের পরে পুনরায় অজু করার দরকার নেই। এরকম করা মাকরুহ। এরকম অভ্যাস কারো থাকলে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

গ. যদি শরীরের অর্ধেক অংশ ধুলে ক্ষতি হয়, আর বাকী অর্ধেক ধুলে ক্ষতি না হয়, তবে এরকম অবস্থায় তায়াম্মুম করতে হবে।

ঘ. গোসলের সময় মেয়েদের জন্য চুলের বেনী খোলার প্রয়োজন নেই। চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছালেই যথেষ্ট হবে।

ঙ. ফোঁড়া কিংবা কোনো ক্ষতের কারণে শরীরের কোনো অংশে পটি বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকলে ঐ স্থানের উপর ভেজা হাতে মাসেহ্ করে নিতে হবে।

চ. চুলকানী বা অন্য কোনো চর্মরোগের কারণে চুলকালে কারো কারো শরীর থেকে রস নির্গত হয়। রস গড়িয়ে পড়ে না। অথচ কাপড়ে লাগলে দাগ পড়ে। এরকম দাগ এক দেরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশী হলেও কাপড় নাপাক হয় না। অজুও ভঙ্গ হয় না।

ছ. যে ব্যক্তির এমন কোনো রোগ আছে, যে রোগের কারণে তার অজু রাখা সম্ভব হয় না। যেমন প্রমেহ রোগের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হয়, কিংবা এ জাতীয় অন্য যে কোনো রোগ থাকলে ঐ ব্যক্তিকে প্রতি ওয়াক্তের নামাজের আগে তাজা অজু করে ঐ অবস্থায়ই নামাজ পড়ে নিতে হবে। ঐ নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার অজু থাকবে। আর যতক্ষণ তার ঐ রোগ থাকবে ততক্ষণ তার কাপড়ও নাপাক হবে না। বিনা সন্দেহে তার পরিধানের কাপড়সহ সে নামাজ পড়তে পারবে। এই সব নিয়ম না জানার কারণে কোনো কোনো লোক উপরোক্ত রোগে আক্রান্ত হলে নামাজ ছেড়ে দেয় এবং বলে ‘আমার অজু থাকে না আমি নামাজ পড়বো কেমন করে।’ শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী এরকম অবস্থায় শরীর নাপাক হয় না একথা জানার পরও দ্বিধা-সন্দেহে লিপ্ত হওয়া চরম মূর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়।

২. কাপড় পাক রাখাঃ

নামাজ পড়তে চাইলে কাপড় পাক রাখতেই হবে। কাপড় পাক করার মাসায়েল ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আরো কিছু কথা জেনে নেয়া ভালো যেমন—

ক. এক দেরহামের বেশী পরিমাণ নাপাকী নামাজীর সঙ্গে থাকলে তার নামাজ হবে না।

খ. রাস্তাঘাটের পানি কাদার ছিটে ফোঁটা কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হবে না।

গ. সাধারণ বৃষ্টির পানি পাক।

৩. নামাজের স্থান পাক হওয়াঃ

নামাজের জায়গা পাক হতে হবে। নামাজীর পা রাখবার স্থান পাক হওয়া সর্বসম্মতভাবে ফরজ। সেজদার স্থানও পাক থাকা ফরজ। সেজদা অবস্থায় দুই হাত, দুই হাঁটু এবং বগল ও বুকের মাঝখানের স্থানও পাক হওয়া জরুরী।

এ সম্পর্কে আরো দু' একটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমন—

ক. নাপাক স্থানে পাতলা কাপড় বিছিয়ে নামাজ পড়লে যদি কাপড়ের নীচের স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, তবে এ অবস্থায় নামাজ হবে না।

খ. তবে ঐ স্থানের উপর শক্ত মোটা কাপড় বা মোটা জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়লে নামাজ হয়ে যাবে।

গ. কোনো কাপড়ের অর্ধেক পাক আর অর্ধেক নাপাক হলে কাপড়টি ভাঁজ করে পাক অংশ উপরে রেখে নামাজ পড়তে হবে।

৪. সতর আবৃত রাখা :

যে সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরজ, নামাজের মধ্যে সেগুলো ঢেকে রাখতে হবে। পুরুষদের জন্য নাভির নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ। আর স্ত্রীলোকের জন্য মুখমণ্ডল, দুই হাতের কজি এবং দুই পায়ের টাখনা (গীরা) ছাড়া সকল শরীর ঢেকে রাখা ফরজ।

এ সম্পর্কে আরো কিছু নিয়ম কানুন জেনে রাখা একান্ত জরুরী।

ক. কোনো স্ত্রীলোক যদি এতো বেশি পাতলা আঁচল বা উড়না দিয়ে মস্তক আবৃত করে যাতে করে মাথার চুলের এক চতুর্থাংশ দেখা যায়— তবে তার নামাজ হবে না।

খ. স্ত্রীলোকের নামাজে হাতের কজির উপরের অংশ খোলা থাকলে নামাজ হবে না। প্রকৃত কথা এই যে, স্ত্রীলোকদের যে সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরজ, ঐ সকল অঙ্গের চার ভাগের এক ভাগ নামাজের মধ্যে অনাবৃত হলেই নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

গ. এই অবস্থায় মেয়েদেরকে মোটা চাদর দিয়ে সকল শরীর আবৃত করে নিয়ে নামাজ পড়তে হবে।

ঘ. অপরের দৃষ্টি থেকে নিজের গুপ্তস্থান ঢেকে রাখা ফরজ। নিজে দেখতে নিষেধ নেই। নামাজ পড়ার সময় কেউ যদি নিজের গুপ্তস্থান দেখে ফেলে, তবুও তার নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু মকরুহ তাহরিমী হবে। আর অন্য কেউ তার গুপ্ত স্থান দেখে ফেললে তার নিজের নামাজ হবে না।

৫. কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানোঃ

কাবা শরীফ যেদিকে, সেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে হবে।

এ সম্পর্কে আরো কিছু কথা জানবার আছে। যেমন—

ক. কেউ কোনো নতুন জায়গায় উপস্থিত হলে অথবা দূরের পথ পাড়ি দিতে কোনো যানবাহনে থাকা অবস্থায় নামাজের সময় যদি কেবলা কোন্ দিকে তা স্থির করতে না পারে, তবে কাছে উপস্থিত কাউকে জিজ্ঞেস করে কেবলা সম্পর্কে তাকে জেনে নিতে হবে।

খ. জিজ্ঞাসা করবার লোক না পাওয়া গেলে মনে মনে কেবলা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। তারপর যদিও কাবা শরীফ আছে বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়— সেদিকে মুখ ফিরিয়েই নামাজ পড়ে নিতে হবে। নামাজের পর যদি জানতে পারে যে, যেদিকে মুখ করে সে নামাজ পড়েছে সেদিক কেবলা ছিলো না— তবুও তার নামাজ হয়ে যাবে। পুনরায় তাকে সঠিক কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়তে হবে না।

গ. মনে মনে চিন্তা না করেই যদি কেউ কোনো একদিকে মুখ করে নামাজ পড়ে নেয়, তবে তার নামাজ হবে না। যদিও পরে জানা যায় যে, তার কেবলা ঠিকই ছিলো। কারণ, কেবলা না জানা থাকলে মনে মনে চিন্তা করে কেবলা ঠিক করাই শরীয়তের নিয়ম।

৬. নিয়ত করাঃ

নিয়ত করা মানে সংকল্প স্থির করা। কোন্ ওয়াক্তের কোন্ নামাজ পড়া হচ্ছে সে সম্পর্কে মনস্থির করতে হবে। যেমন কেউ যদি মনে মনে খেয়াল করে আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে জোহরের নামাজ বা আসরের নামাজ পড়ছি এতেই তার নিয়ত করা হয়ে যাবে। মনে মনে নিয়ত করা ফরজ। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা ফরজ নয়।

এ সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নেয়া ফরজ। যেমন—

ক. সুন্নত, নফল এবং তারাবীর নামাজে ‘আল্লাহ্র ওয়াস্তে নামাজ পড়ছি’, এরকম খেয়াল করে নামাজ শুরু করলেই নামাজ হয়ে যাবে। সুন্নত, নফল অথবা তারাবী নির্দিষ্ট করে না বললেও চলবে।

খ. ফরজ নামাজের বেলায় ফজর, জোহর বা আসর কোন ওয়াক্তের নামাজ পড়া হচ্ছে, তা নির্দিষ্টভাবে খেয়াল করে নিতে হবে।

গ. ইমামের জন্য ইমামতের নিয়ত করা শর্ত নয়। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ওয়াক্তের ফরজ নামাজ একাই পড়তে শুরু করে দেয়— ঐ সময় যদি অন্য কোনো নামাজী এসে তাকে অনুসরণ করে এজ্জদা করে নামাজে শরীক হয়, তবুও তার নামাজ হয়ে যাবে। কিন্তু মোক্তাদীর (অনুসরণকারীর) এজ্জদার (অনুসরণের) নিয়ত করা শর্ত। মোক্তাদীকে ‘এই ইমামের অনুসরণ করলাম’ এরকম খেয়াল অবশ্যই করতে হবে।

ঘ. জোহরের ওয়াক্তে নামাজে দাঁড়িয়ে যদি কেউ ভুলবশতঃ আসর নামাজ পড়ছি এরকম কথা মুখে উচ্চারণ করে, তবুও তার নামাজ হয়ে যাবে। কারণ মুখের নিয়ত ফরজ নয়। মনের নিয়ত ফরজ।

ঙ. নিয়তের সঙ্গে সঙ্গে তকবীরে তাহরীমা (আল্লাহ্ আকবর) বলে নামাজ শুরু করতে হবে।

৭. ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করাঃ

প্রত্যেক নামাজের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত (সময়) আছে। ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে না। আবার ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে নামাজ কাজা হয়ে যাবে। প্রত্যেক নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্ত, মকরুহ ওয়াক্ত এবং নামাজের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেনো, সকল প্রকার নামাজ মোস্তাহাব সময়ে আদায় করা যায়। ইতোপূর্বে নামাজের সময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নামাজ অবস্থায় যে সকল কাজ ফরজ ও এতক্ষণ ধরে নামাজের পূর্বের ৭টি ফরজ কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এখন নামাজের ভিতরে যে কাজগুলো ফরজ সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

নামাজের ভিতরে অর্থাৎ নামাজ অবস্থায় ৬টি কাজ ফরজ। যেমন—

(১) তকবীরে তাহরীমা (২) কেয়াম (৩) কেরাআত (৪) রুকু (৫) সেজদা এবং (৬) কাআদায়ে আখের।

এখন এই ফরজগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. তকবীরে তাহরীমাঃ

‘আল্লাহ্ আকবর’ বলাকে তকবীর বলে। যে তকবীর দিয়ে নামাজ শুরু করা হয় তাকে তকবীরে তাহরীমা বলে।

এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে নেয়া দরকার। যেমন—

ক. তকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের পর নামাজীর জন্য খাওয়া দাওয়া, কথা বলা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজ হারাম হয়ে যায়।

খ. ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তকবীর উচ্চারণ করতে হবে।

গ. তকবীরে আল্লাহ্ উচ্চারণ করবার সময় (ا) অর্থাৎ আলিফ অক্ষর যদি টেনে উচ্চারণ করা হয় এবং আকবর উচ্চারণকালে যদি (ب) অর্থাৎ ‘বা’ অক্ষর টেনে উচ্চারণ করা হয়, তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। ভালো ক্বারীর নিকট থেকে তকবীরের সঠিক উচ্চারণ শিখে নিতে হবে।

ঘ. জামাতে নামাজ পড়বার সময় মোক্তাদী যদি ইমামের আগে তকবীর উচ্চারণ করে, তবে মোক্তাদীর নামাজ হবে না।

২. কেয়ামঃ

কেয়াম অর্থ দাঁড়ানো। দাঁড়িয়ে ফরজ নামাজ আদায় করা ফরজ।

এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে রাখা জরুরী। যেমন—

ক. ফরজ এবং ওয়াজিব নামাজ দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ।

খ. সুন্নত এবং নফল নামাজে দাঁড়ানো ফরজ নয়। কিন্তু সুন্নত বা নফল নামাজ বসে পড়লে অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যায়। আবার ফজরের আগের দুই রাকাত সুন্নত এবং তারাবীর নামাজ বসে না পড়াই উচিত।

গ. দাঁড়াবার সময় দুই পা সোজা কেবলামুখী করে দাঁড়াতে হবে। দুই পায়ের মাঝখানে কমপক্ষে ৪ আঙ্গুল— বেশীপক্ষে ১ বিঘত ফাঁক রাখতে হবে। মেয়েরা দুই পা একসঙ্গে মিলিয়ে দাঁড়াবে। দুই পায়ের মাঝখানে কোনো ফাঁক রাখবে না।

ঘ. শারীরিক অসুস্থতা অথবা অত্যধিক দুর্বলতার কারণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম না হলে বসে নামাজ পড়া যায়। বসে না পড়তে পারলে শুয়েও নামাজ পড়া যায়। এরকম অবস্থায় ঘাড়ের ইশারায় রুকু সেজদা করতে হবে। সেজদার সময় রুকুর চেয়ে মাথা বেশী নত করতে হবে। বাস ট্রেন বা অন্য কোনো যানবাহনে নামাজ আদায় কালে দাঁড়ানো সম্ভব না হলে বসে নামাজ পড়তে হবে।

বসে নামাজ পড়তে সক্ষম না হলে শুয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।

শুয়ে নামাজ পড়বার দুইটি নিয়ম আছে।

(১) পশ্চিম দিকে পা মেলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে।

(২) উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাত হয়ে কেবলার দিকে মুখ রেখে শোবে অথবা দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বাম কাত হয়ে শুয়ে কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে। অবশ্য উত্তর দিকে মাথা রাখাই উত্তম।

৩. কেরাআতঃ

কেরাআত অর্থ নামাজে কোরআন শরীফ পাঠ করা। কোরআন শরীফের যে কোনো স্থান থেকে বড় আয়াত হলে ১ আয়াত এবং ছোট আয়াত হলে ৩ আয়াত পরিমাণ পড়া ফরজ। সূরা ফাতেহা পড়ার পর কেরাআত পড়তে হয়।

এ সম্পর্কে আরো জেনে রাখা প্রয়োজন যে—

ক. জামাতে নামাজ পড়ার সময়ে ইমামের কেরাআতই মুক্তাদীর কেরাআত বলে বিবেচিত হয়। জামাতে মোক্তাদীগণের জন্য কেরাআত পড়া নিষেধ।

খ. একাকী নামাজ পাঠকারীদের জন্য সব ওয়াক্তে ফরজ নামাজের দুই রাকাতে কেরাআত ফরজ।

গ. সুন্নত, নফল এবং বিতির নামাজের সকল রাকাতে কেরাআত ফরজ।

ঘ. জামাতের ইমাম হলে ফজর, মাগরিব এবং এশার নামাজে সশব্দে কেরাআত পড়তে হবে। জুমআ এবং দুই ঈদের নামাজেও সশব্দে কেরাআত পড়তে হবে যেনো অন্যেরা শুনতে পায়। জোহর এবং আসর নামাজে নিজের কান পর্যন্ত পৌঁছে, এরকম আওয়াজে কেরাআত পড়তে হবে।

ঙ. রমজান মাসে জামাতে তারাবী এবং বিতির নামাজের তিন রাকাতেই ইমাম সশব্দে কেরাআত পড়বেন।

চ. একাকী নামাজ পাঠকারী জোহর এবং আসরে চুপে চুপে (নিজের কানে শোনা যায় এমন আওয়াজে) কেরাআত পড়বে। মাগরিব, এশা, ফজর এবং তারাবী নামাজে ইচ্ছা করলে চুপে চুপে অথবা সশব্দে কেরাআত পড়তে পারবে।

ছ. কাজা নামাজে চুপে চুপে কেরাআত পড়া ওয়াজিব।

জ. মেয়েদের জন্য সবরকম নামাজেই নিজের কানে শোনা যায়, এরকম আওয়াজে কেরাআত পড়তে হবে।

৪. রুকুঃ

নামাজে রুকু করা অর্থাৎ পিঠ বাঁকিয়ে সামনের দিকে মাথা নত করা ফরজ।

এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো জেনে রাখতে হবে। যেমন—

ক. দাঁড়িয়ে নামাজ পাঠকালে রুকুর সময় এমন ভাবে পিঠ বাঁকিয়ে দাঁড়াতে হবে, যাতে করে দুই হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

খ. বসে নামাজ পড়লে এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে রুকু করতে হবে যেনো মাথা হাঁটু বরাবর সমান হয়।

গ. রুকু অবস্থায় দুই হাতে দুই হাঁটু চেপে ধরে মাথা এবং পিঠ এক বরাবর রাখতে হবে।

ঘ. মেয়েদের জন্য কোনো রকমে দুই হাত শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে রেখে হাঁটু পর্যন্ত হাত পৌঁছলেই রুকু আদায় হবে।

ঙ. কুঁজো কোনো ব্যক্তি যাকে রুকু অবস্থাতেই দাঁড়াতে হয় তাকে শুধুমাত্র মাথা কিছুটা ঝুঁকিয়ে রুকু আদায় করতে হবে।

৫. সেজদাঃ

সেজদার অর্থ মাটির উপর কপাল রাখা।

এ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী জেনে রাখা উচিত। যেমন—

ক. সেজদার সময় কপাল এবং নাক উভয়টিই মাটিতে স্থাপন করতে হবে। নাক না লাগিয়ে শুধু কপাল মাটিতে লাগলেই সেজদা আদায় হবে। কিন্তু কপাল না লাগিয়ে শুধু নাক লাগালে সেজদা আদায় হবে না।

খ. কপালে জখম বা কোনো রকম ব্যথা থাকলে শুধু নাক মাটিতে লাগালেও সেজদা আদায় হবে।

গ. সেজদার সুন্যত নিয়ম, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল— শরীরের এই সাতটি অঙ্গ মাটিতে রাখা। দুই পা এবং কপাল মাটিতে রাখা ফরজ।

ঘ. সেজদার সময় দুই পা একই সঙ্গে মাটি থেকে উঠে গেলে (একটি আঙ্গুলও যদি মাটিতে না থাকে) নামাজ নষ্ট (বাতিল) হয়ে যাবে।

ঙ. কপাল মাটিতে ঠেকলে পাগড়ীর প্যাচের উপরে সেজদা করা জায়েয (বৈধ)। পরিধেয় কাপড়ের কোনো অংশ এবং গায়ের চাদর বা চাদরের অংশ সেজদার স্থানে পড়ে গেলে তার উপর সেজদা করা জায়েয।

চ. তোষক বা গদির উপরে সেজদা করলে আলতোভাবে মাথা লাগালে সেজদা আদায় হবে না। এরকম অবস্থায় কপাল জোরে দাবিয়ে সেজদা করতে হবে।

ছ. অত্যধিক ভীড়ের কারণে একই নামাজের জামাতে শরীক সামনের নামাজীর পিঠের উপর কপাল স্থাপন করলেও সেজদা আদায় হয়ে যাবে।

জ. সেজদা পর পর দুইবার দিতে হবে। দুই সেজদাই ফরজ।

ঝ. যদি সেজদার সময় পায়ের সকল আঙ্গুল খাড়া না রেখে পায়ের পিঠ মাটিতে লাগিয়ে রাখে, তবে নামাজ জায়েজ হবে না। উভয় পায়ের কমপক্ষে একটি আঙ্গুল কেবলামুখী করে খাড়া রাখতে হবে।

ঞ. দাঁড়াবার স্থান অপেক্ষা সেজদার স্থান যদি আধাহাত বা বারো আঙ্গুল উঁচু হয়, তবে সেজদা ঠিকই হবে। কিন্তু সেজদার স্থান আধাহাতের বেশী উঁচু হলে সেজদা ঠিক আদায় হবে না।

৬. কাআদায়ে আখেরঃ

কাআদায়ে আখের— নামাজের শেষ বৈঠককে বলা হয়। দুই রাকাতবিশিষ্ট নামাজ হোক বা তদপেক্ষা বেশী রাকাতবিশিষ্ট নামাজ হোক, নামাজের শেষ বৈঠকে বসা ফরজ।

এ সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যে—

ক. তাশাহহুদ পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ফরজ। অর্থাৎ আন্তাহিয়াতু লিল্লাহে থেকে আবদুহু ওয়া রসুলুহু বলা পর্যন্ত সময়।

খ. ফরজ, নফল— সব রকম নামাজেই শেষ বৈঠকে বসা ফরজ।

সংক্ষিপ্তসারঃ

নামাজের ফরজ সংক্রান্ত এতক্ষণের আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম যে, নামাজের বাইরে ভিতরে মোট ফরজ ১৩টি। যেমন—

১. শরীর পাক করা। ২. কাপড় পাক রাখা ৩. নামাজের স্থান পাক হওয়া। ৪. সতর আবৃত রাখা। ৫. কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো। ৬. নিয়ত করা। ৭. ওয়াজ মতো নামাজ পড়া। ৮. তকবীরে তাহরীমা বলা। ৯. কেয়াম করা। ১০. কেরাআত পড়া। ১১. রুকু করা। ১২. পর পর দুইবার সেজদা করা এবং ১৩. নামাজের শেষ বৈঠকে বসা।

নামাজের ওয়াজিবসমূহ

নামাজের ওয়াজিব আমল মোট ১৩টি। যেমন—

১. ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে এবং বিতির, নফল এবং সুন্নত নামাজের সব রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া।

২. সূরা ফাতেহার পরে একটি পূর্ণ সূরা অথবা কোরআন শরীফের যে কোনো একটি বড় আয়াত কিংবা ছোট তিনটি আয়াত পড়া।

৩. নামাজের প্রথম দুই রাকাতে কেরাআত পড়া।

৪. তরতীব অর্থাৎ ধারাবাহিকতা রজায় রাখা। যেমন— সূরা ফাতেহার পরে অন্য কোনো একটি সূরা পড়া, তারপর রুকু করা।

৫. তাদীলে আরকান অর্থাৎ নামাজের ভিতরের প্রতিটি আমল ধীরে সুস্থে নিয়ম মতো আদায় করা, তাড়াহুড়া না করা, যেমন— রুকু এবং দুই সেজদার মাঝখানে এক তসবী (সোবহানাল্লাহ্) পড়ার সময় পরিমাণ স্থির থাকা।

৬. প্রথম বৈঠক অর্থাৎ তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজে দুই রাকাত পড়ার পর তাশাহুদ (আত্যাহিয়াতু) পড়বার সময় পরিমাণ বসা।

৭. প্রথম এবং সর্বশেষ বৈঠকে তাশাহুদ (আত্যাহিয়াতু) পড়া।

৮. ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্’ বলে নামাজের সমাপ্তি ঘোষণা করা।

৯. বিতিরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়া।

১০. প্রত্যেক ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয়টি তকবীর (আল্লাহু আকবর) বলা।

১১. যে সকল নামাজে উচ্চস্বরে কেরাআত পড়বার নিয়ম সে সকল নামাজে উচ্চস্বরে কেরাআত পড়া।

১২. যে সকল নামাজে চুপে চুপে কেরাআত পড়ার নিয়ম, সে সকল নামাজে চুপে চুপে কেরাআত পড়া।

১৩. সেজদার সময় দুই হাত এবং দুই হাঁটু মাটিতে রাখা।

এ সম্পর্কে কিছু নিয়ম কানুন জেনে রাখা জরুরী। যেমন—

ক. ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতের যে কোনো রাকাতে এবং নফল, সুন্নত ও বিতির নামাজের যে কোনো রাকাতে সূরা ফাতেহা অথবা সূরা ফাতেহার যে কোনো আয়াত পড়তে ভুলে গেলে সোহ্ সেজদা করা ওয়াজিব হবে।

খ. ফরজের তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য কোনো সূরা পড়তে হয় না। তবে যদি কেউ পড়ে ফেলে তবে নামাজের ক্ষতি হবে না।

গ. চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের সূরা ফাতেহার পর যদি কেউ অন্য কোনো সূরা বা আয়াত পড়তে ভুলে যায় তবে শেষ দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়ে নিতে হবে এবং সোহ্ সেজদা করে নিতে হবে।

ঘ. সূরা ফাতেহার পরে কেরাআত পড়তে হয়। কিন্তু ভুলক্রমে কেউ যদি সূরা ফাতেহা পড়ার আগেই কেরাআত পড়া শুরু করে দেয়, তবে সোহ্ সেজদা দিলে নামাজ ঠিক হয়ে যাবে।

ঙ. কওমা (রংকুর পরে দাঁড়ানো) এবং জলসা (দুই সেজদার মাঝখানে বসা) ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামাজ দোহরানো (পুনরায় নতুন করে পড়া) ওয়াজিব। ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে সোহ্ সেজদা করা ওয়াজিব।

চ. তাশাহুদদের যে কোনো একটি শব্দ বাদ পড়লেও সোহ্ সেজদা ওয়াজিব হবে। আবার চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের প্রথম বৈঠকে তাশাহুদদের পর দরুদ শরীফের ‘আল্লাহুম্মা সাল্লা আলা মোহাম্মদ’ এতটুকু পড়ে ফেললেই সোহ্ সেজদা ওয়াজিব হবে।

ছ. নামাজ শেষে সালাম ফিরাবার সময় একাকী নামাজ পাঠকারী ডানে বামে ফেরেশতাদের সালাম করছি, এরকম নিয়ত করবে। জামাতের ইমাম দুই পাশের ফেরেশতা এবং মোক্তাদীদেরকে, মোক্তাদীগণ উভয় পাশের ফেরেশতা ও জামাতে শরীক অন্যান্য নামাজীদেরকে এবং সেই সঙ্গে যে পাশে ইমাম থাকেন সেই পাশে ইমামকে সালাম করছি এরকম নিয়ত করবে। আর ঠিক ইমামের পিছনে উপবিষ্ট নামাজী দুই পাশের ফেরেশতা অন্যান্য নামাজীর সঙ্গে দুই দিকেই ইমামকে সালাম করছি নিয়ত করবে।

জ. বিতির নামাজে নির্দিষ্ট দোয়া কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব। দোয়া কুনুত মুখস্থ না থাকলে এবং মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো দোয়া যেমন- রব্বানা আতিনা ফিদ্বুনিয়া হাসানা তাও....ওক্বিনা আজাবান্নার অথবা ইয়া রব্বিগফিরলি ইত্যাদি দোয়া পাঠ করলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

ঝ. ভুলক্রমে দোয়া কুনুত বাদ পড়লে সোহ্ সেজদা করতে হবে।

ঞ. মোক্তাদীর জন্য ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। রসূলে পাক স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তায়ালা তার মাথা গাধার মত করে না দেন। (বোখারী ও মুসলিম)।

ট. মাগরিব, এশা এবং ফজর নামাজের জামাতে ইমাম যদি কিছুক্ষণ চুপে চুপে কোরআন পাঠ করেন তবে সোহ্ সেজদা করতে হবে। আবার জোহর এবং আসর নামাজের জামাতে ইমাম যদি কিছুক্ষণ ভুলক্রমে জোরে কেরাআত পাঠ করেন, তবে সোহ্ সেজদা করতে হবে।

ঠ. প্রত্যেক রাকাতে পর পর দুইবার সেজদা করা ফরজ। নামাজী যদি এক রাকাতে এক সেজদা করার পর অপর সেজদার কথা ভুলে যায়, তবে যখনই একথা মনে পড়বে, তখনই বাদপড়া সেজদা আদায় করে নিবে এবং সালাম ফিরাবার আগে সোহ্ সেজদা করবে। কারণ তরতীব (ধারাবাহিকতা) রক্ষার প্রতি খেয়াল রাখা ওয়াজিব ছিলো।

সোহ্ সেজদা কাকে বলে?

সোহ্ সেজদা হলো সংশোধনের সেজদা। ভুলবশতঃ নামাজের কোনো রোকন (অঙ্গ) যথাস্থানে আদায় না করলে অর্থাৎ পূর্বের রোকন পরে এবং পরের রোকন আগে আদায় করে ফেললে সোহ্ সেজদা করতে হয়। যেমন—কেরাআতের আগে রুকু করা, বিতির নামাজে দোয়া কুনুত পড়ার আগে রুকুতে চলে যাওয়া অথবা তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে দুই রাকাত পর বসে তাশাহুদ পড়ার পর ভুলে দরুদ পড়তে শুরু করা বা তাশাহুদের পর সঙ্গে সঙ্গে না দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেরী করা যাতে তৃতীয় রাকাত শুরু করতে দেরী হয়ে যায়— অথবা কোনো রোকন দুই বার করে ফেলা— যেমন পর পর দুইবার রুকু করা এরকম অবস্থায় সোহ্ সেজদা করে নামাজের ভুল সংশোধন করে নিতে হয়। মোট কথা নামাজের ওয়াজিবসমূহের মধ্যে যে কোনো এক বা একাধিক ওয়াজিব ভুলবশতঃ আদায় না করলে সোহ্ সেজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

সোহ্ সেজদা করার নিয়ম

নামাজের শেষ বৈঠকে সোহ্ সেজদা করতে হয়। এর নিয়ম হচ্ছে— তাশাহুদ পড়ার পর ডানে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে সালাম ফিরিয়ে পর পর দুই বার সেজদা করে নিতে হবে। তারপর বসে তাশাহুদ, দরুদ শরীফ এবং দোয়া মাসুরা পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

সোহ্ সেজদার ব্যাপারে আরো কিছু কথা জেনে নেয়া প্রয়োজন। যেমন—

১. ইচ্ছা করে হোক বা অনিচ্ছায় হোক নামাজের কোনো ফরজ রোকন ত্যাগ করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় নতুন করে নামাজ আদায় করতে হবে। আর নামাজের কোনো ওয়াজিব রোকন ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলেও নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং পুনরায় নামাজ পড়তে হবে। আর ভুলবশতঃ যদি কোনো ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়, তবে সোহ্ সেজদা করে নিলে নামাজ ঠিক হয়ে যাবে।

২. জামাতে নামাজ পাঠকালে মোক্তাদীর ভুল হলে সোহ্ সেজদা ওয়াজিব হয় না। ইমামের ভুল হলে সোহ্ সেজদা ওয়াজিব (জরুরী) হয়ে পড়ে। ইমাম সোহ্ সেজদা করলে মোক্তাদীদেরও তাঁর অনুসরণ করতে হবে।

৩. তিন বা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে প্রথম দুই রাকাত নামাজের পর বসতে হয়, তখন ভুল করে যদি কোনো নামাজী দাঁড়াতে আরম্ভ করে তৎক্ষণাৎ এই ভুল বুঝতে পারলে দেখতে হবে তার অবস্থা বসার নিকটবর্তী না দাঁড়ানো অবস্থার নিকটবর্তী। যদি বসার নিকটবর্তী হয় তবে বসে পড়বে এবং তাশাহুদ পড়ে নিয়ে নিয়মমতো নামাজ শেষ করে নিবে। সোহ্ সেজদা করতে হবে না। আর যদি তাঁর তখনকার অবস্থা দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয় তবে দাঁড়িয়ে যথারীতি নামাজ আদায় করে সোহ্ সেজদা করে নিয়ে নামাজ শেষ করবে।

৪. চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে না বসে যদি কোনো নামাজী ভুলে দাঁড়িয়ে যায় এবং পঞ্চম রাকাতের রুকু করার আগেই যদি ভুল বুঝতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ বসে পড়বে এবং সোহ্ সেজদা করে নামাজ শেষ করবে। আর যদি পঞ্চম রাকাতের রুকু শেষ করার পর ভুল বুঝতে পারে তবে আরও এক রাকাত পড়ে নিতে হবে। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ ছয় রাকাত নামাজই নফল নামাজ হয়ে যাবে। সোহ্ সেজদা করতে হবে না। ফরজ পুনরায় পড়তে হবে। আর যদি পাঁচ রাকাতের পর বসে সালাম ফিরায়ে তবে চার রাকাত নফল হবে। এক রাকাত বাতিল হবে। ফরজ পুনরায় পড়তে হবে।

৫. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর যদি ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে যায় এবং পঞ্চম রাকাতের সেজদা না করে থাকে, এমন অবস্থায় ভুল বুঝতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়বে এবং সোহ্ সেজদা করে নামাজ শেষ করবে। আর যদি পঞ্চম রাকাতের সেজদা করেই ফেলে, তখন আর এক রাকাত পড়ে নিয়ে সোহ্ সেজদা করে নামাজ শেষ করতে হবে। এমন অবস্থায় ছয় রাকাত নামাজ হবে এবং প্রথম চার রাকাত ফরজ এবং শেষের দুই রাকাত নফল বলে গণ্য হবে। এই নফল নষ্ট হলে কোনো ক্ষতি নেই। আর যদি পঞ্চম রাকাত শেষ করেই সালাম ফিরায়ে তবে চার রাকাত ফরজ আদায় হবে এবং বাড়তি এক রাকাত বৃথা যাবে। এজন্য কোনো গোনাহ্ হবে না।

৬. মাগরিবের নামাজে এমন হলে প্রথম তিন রাকাত ফরজ এবং শেষ দুই রাকাত নফল বলে গণ্য হবে। ফজরের নামাজে এমন হলে প্রথম দুই রাকাত ফরজ এবং শেষ দুই রাকাত নফল হবে।

৭. ইমাম শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পরিমাণ পড়ে ভুলে যদি দাঁড়িয়ে যায়, তবে মোক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে না। জেনে শুনে ভুলের অনুসরণ করা অনুচিত। ইমাম যদি ইতোমধ্যে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সেজদার আগেই বসে যায় এবং সালাম ফিরায়ে, তবে মোক্তাদীগণও তাঁর সঙ্গে সালাম ফিরাবে। আর যদি ইমাম অতিরিক্ত রাকাতের সেজদা করেই ফেলে, তবে মোক্তাদীগণ নিজে নিজে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।

৮. একই নামাজে কয়েকবার ভুল হলে তার জন্য একবারই সোহ্ সেজদা যথেষ্ট। একবার সোহ্ সেজদার পর যদি আবার কোনো ওয়াজিব বাদ পড়ে বা উল্টা পাল্টা হয়ে যায় তবে তার জন্য আবার সোহ্ সেজদা করতে হবে।

৯. জীবনের সর্ব প্রথম নামাজে যদি কয় রাকাত পড়া হলো এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে নামাজ ছেড়ে দিয়ে পুনরায় নামাজ শুরু করবে। আর যদি প্রায়ই

নামাজে এরকমের সন্দেহের উদ্বেক হয়, তবে যে কয় রাকাত পড়েছে বলে ধারণা প্রবল হয়, সেই কয় রাকাতই ধরে নিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

১০. যদি কত রাকাত পড়েছে তা কিছুতেই মনে মনে নির্ধারণ করতে সক্ষম না হয়, তবে কম সংখ্যক রাকাত ধরতে হবে এবং সেই হিসাবেই নামাজ শেষ করতে হবে। যেমন যদি সন্দেহ হয় আসরের তিন রাকাত হলো, না চার রাকাত হলো— তবে তিন রাকাতই ধরে নিবে এবং আর এক রাকাত পড়ে নিয়ে নামাজ শেষ করবে। তাহলে চার রাকাতের সন্দেহ আর থাকবে না। কিন্তু ঐ তিন রাকাতের পর একবার বসে নিবে। কারণ যদি ঐ রাকাত আসলে শেষ রাকাত হয় তবে শেষ বৈঠক যে ফরজ তা বাদ পড়বে না।

১১. যে কোনো নামাজের শেষ বৈঠকের পর ভুলে দাঁড়ানোর সময় যদি নামাজী দাঁড়ানো অবস্থার চেয়ে বসা অবস্থার অধিক নিকটবর্তী থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে যথারীতি নামাজ শেষ করতে হবে। সোহ্ সেজদার প্রয়োজন হবে না।

১২. কেউ যদি ডান দিকে সালাম না ফিরিয়ে শুধু তাশাহুদ, দরুদ এবং দোয়া মাসুরা পড়ে সোহ্ সেজদা করে তবুও সোহ্ সেজদা হয়ে যাবে এবং নামাজও ঠিক থাকবে।

১৩. ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়তে ভুলে গেলে শেষ দুই রাকাতে সূরা পড়ে নিবে এবং সোহ্ সেজদা করবে। যদি প্রথম রাকাতে সূরা পড়তে ভুলে যায়, তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা পড়ে নিবে এবং সোহ্ সেজদা করবে।

১৪. রমজানে তারাবীর জামাতে এবং বিতির নামাজের জামাতে ইমাম যদি উচ্চস্বরে কেরাআত পড়তে ভুলে যায়, তবে সোহ্ সেজদা করতে হবে।

মোট কথা, নামাজের কোনো ফরজ অঙ্গ বাদ পড়লে সোহ্ সেজদার মাধ্যমে তার সংশোধন হয় না। নামাজ পুনরায় পড়তে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব অঙ্গ বাদ দিলেও সোহ্ সেজদার দ্বারা নামাজ সংশোধিত হয় না। পুনরায় নামাজ পড়তে হয়। শুধু কোনো ওয়াজিব অঙ্গ ভুলবশতঃ বাদ পড়লে সোহ্ সেজদার মাধ্যমে নামাজের সংশোধন হয়ে যায়। এ ছাড়াও নামাজের মধ্যে অনেক সুন্নত এবং মোস্তাহাব আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নত বাদ দিলে গোনাহ্ হয়। কিন্তু সোহ্ সেজদা না করলেও নামাজ হয়ে যায়। আর ভুলে কোনো সুন্নত বাদ পড়লে গোনাহ্ও হয় না। সোহ্ সেজদা তো করতে হয়ই না। আর মোস্তাহাব বাদ পড়লে তা ইচ্ছাকৃত হোক আর ভুলবশতঃই হোক— গোনাহ্ও হয় না। সোহ্ সেজদাও করতে হয় না।

সুতরাং প্রত্যেক নামাজীর ভালোভাবে পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এবং মোস্তাহাব সম্পর্কে জানা থাকা একান্ত জরুরী, যাতে সে সবরকম ভুল সোহ্ সেজদার মাধ্যমে সংশোধন করবার চেষ্টা না করে এবং অনাবশ্যকভাবে এবং ঢালাওভাবে সোহ্ সেজদার অপব্যবহার না করে।

ইতোপূর্বে আমরা নামাজের ফরজ এবং ওয়াজিব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন বর্ণনা করবো সুন্নত এবং মোস্তাহাব সম্পর্কে।

নামাজের সুন্নতসমূহ

নামাজের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলো সুন্নত। যেমন—

(১) তকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত উঠানো। (২) তকবীরে তাহরীমার পর হাত বাঁধা। (৩) ছানা পড়া। (৪) আউজুবিল্লাহ পড়া। (৫) বিসমিল্লাহ পড়া। (৬) তিন রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজের তৃতীয় রাকাতে এবং চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া। (৭) নামাজে উঠা-বসার সময় তকবীর (আল্লাহ আকবর) বলা। (৮) রুকুর তসবী পড়া। (৯) সেজদার তসবী পড়া। (১০) রুকু থেকে মাথা উঠাবার সময় সামিআ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলা। (১১) তারপর রব্বানা লাকাল্ হামদ্ বলা। (১২) আত্যাহিয়াতুর পর দরুদ শরীফ পড়া। (১৩) সূরা ফাতেহা শেষ হলে চুপে চুপে আমিন বলা। (১৪) দোয়া মাছুরা পড়া। (১৫) নামাজ শেষে সালাম ফিরানো ইত্যাদি।

নামাজের সুন্নত বিষয়ে আরো কিছু বিস্তারিত জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমন—

ক. তকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ কালে দুই হাত উঠিয়ে কেবলামুখী করে রাখতে হবে। হাতের আঙ্গুলগুলো মিলানোও থাকবে না। বেশী ফাঁকও থাকবে না। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে। পুরুষের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের লতি বরাবর রাখবে। আর মহিলারা হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কাঁধ বরাবর তুলবে।

খ. পুরুষেরা নাভি বরাবর অথবা তার নীচে বাম হাত রেখে তার উপর ডান হাত রেখে ডান হাতের বৃদ্ধা এবং কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি বেঁটন করে ধরবে এবং বাকী তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপরে রাখবে। আর মেয়েরা বুকে বাম হাত রেখে তার উপর ডান হাত রাখবে।

গ. ইমাম, মোক্তাদী, একাকী নামাজী সবাইকে ছানা পড়তে হয়। ইমাম শব্দে কেরাআত শুরু করে দিলে মোক্তাদী কেরাআতের দিকে মনোযোগ দিবে। ছানা পড়বে না।

ঘ. ইমাম এবং একাকী নামাজ আদায়কারী ছানা পড়ার পর আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির্ রজীম পড়বে।

ঙ. ইমাম এবং একা নামাজী আউজুবিল্লাহর পর সূরা ফাতেহা শুরু করার আগে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়বে।

চ. নামাজে উঠাবসার সময় ইমাম উচ্চস্বরে তকবীর বলবেন। মোক্তাদী চুপে চুপে তকবীর বলবেন।

ছ. রক্ষুতে কমপক্ষে তিনবার ‘সোবহানা রব্বিয়াল আজীম’ পড়বে। ইচ্ছা করলে বেজোড় সংখ্যক ঠিক রেখে আরো বেশী বার পড়া যায়। ইমামের পক্ষে পাঁচবারের বেশী না পড়া উচিত। সেজদার তস্বী ‘সোবহানা রব্বিয়াল আ’লা’ও এই নিয়মে পড়তে হবে।

জ. রক্ষু থেকে মাথা উঠিয়ে এবং দুই সেজদার মাঝখানে বসে অপেক্ষা করা সুন্নত। যেনো সেই সময় শরীরের প্রতিটি অঙ্গ নিজ নিজ স্থানে শান্তভাবে ধারণ করে।

ঝ. আত্যাহিয়াতুর পর দরুদ শরীফ (দরুদে ইব্রাহিম) এবং দোয়া মাছুরা পাঠ করা সুন্নত।

ঞ. ইমাম, মোক্তাদী এবং একাকী নামাজী সূরা ফাতেহা শেষ হলে চুপে চুপে আমিন বলবে।

ট. পুরুষগণ বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে বসবেন এবং ডান পা এমন ভাবে খাড়া রাখবেন যেনো পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী থাকে। এরকম অবস্থায় বসা সুন্নত। মেয়েদের জন্য দুই পা ডান পাশে রেখে নিতম্বের উপরে বসা সুন্নত।

নামাজের মোস্তাহাবসমূহ

১. দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে রাখা। দাঁড়ানো অবস্থায় সেজদার স্থানে, রক্ষুর সময় দুই পায়ের পাতার উপর, সেজদার সময় নাকের অগ্রভাগে, বসা অবস্থায় কোলের উপর এবং ডানে বামে সালাম ফিরাবার সময় কাঁধের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে।

২. নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত চাদরের ভিতরে থাকলে তকবীরে তাহরীমার সময় হাত চাদরের বাইরে বের করতে হবে। মেয়েরা হাত বের করবে না। অত্যধিক শীতের কারণে পুরুষেরাও চাদরের ভিতরে হাত রেখে তকবীরে তাহরীমা বলতে পারবে।

৩. হাই এলে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।

৪. যতদূর সম্ভব কাশি, হাঁচি চেপে রাখতে হবে।

৫. মোয়াজ্জিন একামতের সময় হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্ বলার সময় মোক্তাদীগণ নামাজের জন্য দাঁড়াবে।

৬. ক্বাদ্‌কামাতিস্ সালাহ্ বললে ইমাম নামাজ শুরু করবেন।

৭. তরতীলের সঙ্গে অর্থাৎ ধীরে ও স্পষ্টভাবে সঠিক উচ্চারণে কোরআন শরীফ পাঠ করতে হবে।

৮. রুকুর সময় মাথা, পিঠ এবং কোমর এক বরাবর থাকতে হবে।

৯. সেজদায় যাবার সময় প্রথমে দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং তারপর কপাল জমিনে স্থাপন করতে হবে। সেজদা থেকে ওঠার সময় ঠিক এর বিপরীত করতে হবে।

১০. সেজদার সময় উভয় হাত এভাবে মাটিতে রাখতে হবে যেনো দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দুই কান বরাবর থাকে। পায়ের অবস্থান থেকে আড়াই হাত অথবা পৌনে তিনহাত দূরত্বে মাথা মাটিতে রেখে সেজদা করতে হবে।

১১. সেজদার সময় হাত এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী রাখতে হবে।

১২. দাঁড়াবার সময় দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল ফাঁক রাখতে হবে।

১৩. তকবীরে তাহরীমার সময় এবং বসা অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে ঘেরকম ফাঁক থাকে, সেরকম ফাঁক রাখতে হবে।

১৪. রুকু অবস্থায় হাঁটু চেপে ধরার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক রাখতে হবে।

১৫. সেজদার সময় হাতের সব আঙ্গুলগুলো মিলিত অবস্থায় মাটিতে রাখতে হবে।

১৬. বসা অবস্থায় দুই হাত উরুর উপর এমনভাবে রাখতে হবে যেনো আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ হাঁটুর সমান সমান থাকে।

১৭. সালামের সময় প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরাতে হবে।

১৮. একাকী নামাজী রুকু ও সেজদার তস্বী তিনবারের বেশী বেজোড় সংখ্যক যেমন ৫, ৭ অথবা ৯ বার পড়তে পারবে।

১৯. ইমামের জন্য পাঁচবার বলাই যথেষ্ট, যাতে করে মোক্তাদীগণ কমপক্ষে তিনবার রুকু এবং সেজদায় তস্বী পড়তে পারে।

২০. পুরুষগণ রুকু এবং সেজদায় কপাল এবং বুকোর পার্শ্বদেশ খোলা (আলগা) রাখবে।

২১. সেজদার সময় পেটকে রান এবং উরু থেকে পৃথক রাখতে হবে।

২২. মেয়েরা দাঁড়াবার সময় দুই পা একত্রিত করে কেবলামুখী রেখে দাঁড়াবে। রুকুর সময় দুই হাত শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে এবং সেজদার সময় বগল পেটের সঙ্গে, পেট উরুর সঙ্গে, উরু পায়ের নিম্নাংশের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিত অবস্থায় কেবলামুখী করে রাখবে।

যে সব কারণে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়

নামাজ ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়, এরকম কারণগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন যাতে করে এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া যায়। তাই নিম্নবর্ণিত মাসায়েল সম্পর্কে জেনে রাখা জরুরী।

১. নামাজের মধ্যে কথা বলা। এক শব্দ অথবা অর্থবোধক একটি অক্ষর উচ্চারণ করলেও নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২. নামাজ অবস্থায় কাউকে সালাম দিলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩. কারও সালামের জবাব দিলেও নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৪. বিনা প্রয়োজনে নামাজে কাশলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ আপনা আপনি কাশি এসে গেলে অথবা না কেশে কেরাআত পড়া সম্ভব না হলে অথবা কফ জমার কারণে কাশতে বাধ্য হলে নামাজ ফাসেদ হবে না।

৫. নামাজে উফ্ উফ্ অথবা উহ্ উহ্ শব্দ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৬. বেদনা বা দুঃখ-কষ্টের কারণে চিৎকার করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু কেরাআত শুনে আল্লাহ্র প্রেমাতিশয়ে, বেহেশতের আশায় অথবা দোজখের ভয়ে ভীত হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কেঁদে ফেলে, তবে নামাজ ফাসেদ হবে না।

৭. কারো হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বললে নামাজ ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু নামাজী যদি নিজের হাঁচির পরে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে তবে নামাজ ফাসেদ হবে না।

৮. নামাজ অবস্থায় কোনো শুভসংবাদ কানে আসার কারণে আলহামদুলিল্লাহ্ বললে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়।

৯. তেমনি নামাজ অবস্থায় অশুভসংবাদ কানে এলে কেউ 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' বললেও নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়।

১০. আশ্চর্যজনক সংবাদ শুনে সোবহানাল্লাহ্ বললে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. নামাজ অবস্থায় কোরআন শরীফ দেখে কেরাআত পড়লে নামাজ ফাসেদ হয়।

১২. নামাজে উচ্চস্বরে হাসলে নামাজ নষ্ট হয়।

১৩. ভুলবশতঃ অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলেও নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। দাঁতের ফাঁকে আটকানো কোনো আহার্যকণা, যা আকৃতিতে বুটের দানার চেয়ে ছোট, তা গিলে ফেললে নামাজ নষ্ট হবে না।

১৪. আমলে কাছীর বা এমন কোনো কাজ করা যাতে দূর থেকে দেখলে নামাজী নামাজ অবস্থায় নয় বলে মনে হয়, তবে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

১৫. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজে কোরআন শরীফ ভুল পড়লে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল পড়লে তা ক্বারীর (কোরআন পাঠকারীর) পদস্থলন

বলে গণ্য হবে এবং নামাজ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ভুল উচ্চারণের কারণে যদি অর্থের বিকৃতি ঘটে থাকে, তবে নামাজ ফাসেদ হবে।

১৬. নামাজে কোরআন পড়তে গিয়ে যদি মারাত্মক কোনো ভুল হয়ে যায়, তবে পুনরায় তা শুদ্ধ করে পড়ে নিলে নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

১৭. জামাতে নামাজ পাঠকারী মোক্তাদী যদি তার নিজের ইমামকে লোকমা দেয়, তবে নামাজ ফাসেদ হয় না। ইমাম তার লোকমা গ্রহণ করণ আর না করণ। এমতাবস্থায় ইমাম মোক্তাদী কারোই নামাজ নষ্ট হয় না। ইমাম কেরাআত ভুল পড়লে, কোনো ফরজ অথবা ওয়াজিব ছেড়ে দিলে মোক্তাদীরা যদি তা স্মরণ করিয়ে দেয় তবে তাকে লোকমা বলে।

১৮. নামাজী ব্যক্তি যদি নামাজ পড়ছে না এরকম কারো লোকমা গ্রহণ করে তবে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

১৯. নামাজী ব্যক্তি যদি পৃথকভাবে নামাজ পাঠকারী অন্য ব্যক্তিকে লোকমা দেয়, তবে লোকমাদানকারী ব্যক্তির নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর তার লোকমা অন্য নামাজী গ্রহণ করলে তারও নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

২০. মানুষের কাছে চাওয়া হয়— যেমন, আমাকে টাকা দাও, খাবার দাও— এরকম কোনো প্রার্থনা নামাজের মধ্যে করলে নামাজ ফাসেদ হয়।

২১. নাপাক স্থানে সেজদা করলে নামাজ ফাসেদ হয়।

সতর্কবাণী

নামাজ ফাসেদ হয়ে গেলে পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে।

যে সকল কারণে নামাজ মাকরুহ হয়

কিছু কাজ এমন আছে যাতে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায় না বটে, কিন্তু নামাজের সৌন্দর্যহানি ঘটে। মাকরুহ হলে নামাজ পুনরায় পড়বার দরকার হয় না। কিন্তু নামাজকে সর্বাপেক্ষ সুন্দর করতে গেলে মাকরুহ বিষয়াদি থেকেও বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

মাকরুহ বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

(১) মাথা কিংবা কাঁধের উপর কাপড় রেখে তার দুই প্রান্তদেশ সোজা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়া।

(২) নামাজ অবস্থায় কাপড় সামলানো।

(৩) কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা।

- (৪) নামাজে আঙ্গুল ফুটানো।
- (৫) ঘাড় ফিরিয়ে ডানে বামে তাকানো।
- (৬) নামাজে মোড়ামুড়ি এবং হেলাদোলা করা।
- (৭) প্রকাশ্যভাবে হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে তসবী অথবা আয়াত গণনা করা।
- (৮) নাক ঝাড়া।
- (৯) সেজদার পূর্বে সেজদার স্থানে অবস্থিত কঙ্করাদি একাধিকবার সরাবার চেষ্টা করা।
- (১০) কোমরে হাত রাখা।
- (১১) বিনা কারণে হাঁটু খাড়া করে কুকুরের মতো বসা।
- (১২) পুরুষদের দুই হাত মাটিতে বিছিয়ে সেজদা করা।
- (১৩) বিনা কারণে জানু পেতে বসা।
- (১৪) হাই উঠলে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা না করা। চেষ্টা করে বন্ধ না করতে পারলে বাম হাতের পিঠি মুখের উপরে রাখতে হবে।
- (১৫) ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ বন্ধ করা।
- (১৬) ভিড় না থাকলেও ইমামের মেহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো।
- (১৭) ইমামের এক হাত পরিমাণ উঁচু অথবা এক হাত পরিমাণ নীচু স্থানে দাঁড়ানো।
- (১৮) কপালের মাটি বা ঘাম মোছা।
- (১৯) দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের উপরে সমান ভর না রাখা।
- (২০) আকাশের দিকে তাকানো।
- (২১) পাগড়ীর প্যাঁচের উপরে সেজদা করা যাতে কাপাল মাটিতে না লাগে।
- (২২) প্রাণীর ছবিসম্বলিত কাপড় পরিধান করা।
- (২৩) নামাজীর সামনে, মাথার উপরে, ডানে, বামে, ঠিক পিছনে প্রাণীর ছবি থাকা।
- (২৪) অবহেলা করে খালি মাথায় নামাজ পড়া। তবে বিনয় নম্রতা প্রকাশের নিয়তে অথবা মাথা যন্ত্রণা ইত্যাদি কোনো কারণবশতঃ খালি মাথায় নামাজ পড়া মাকরুহ নয়।
- (২৫) পেশাব পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামাজ পড়া।
- (২৬) ভালো কাপড় থাকতেও ছেড়া ফাঁড়া বা ময়লা কাপড় পরে নামাজ পড়া।
- (২৭) কেরাআতকে রুকুতে গিয়ে অথবা রুকুতে যেতে যেতে শেষ করা।
- (২৮) রুকুর তসবী পড়তে পড়তে সেজদা থেকে মাথা উঠানো।
- (২৯) সেজদার তসবী পড়তে পড়তে সেজদা থেকে মাথা উঠানো।

- (৩০) দাঁতের ফাঁক থেকে বুটের দানা পরিমাণ খাদ্যকণা বের করে গিলে ফেলা ।
- (৩১) নামাজে কোনো বিশেষ সূরা নির্দিষ্ট করে নেয়া ।
- (৩২) একই রাকাতে মাঝের সূরা বাদ দিয়ে দুই সূরা পড়া ।
- (৩৩) কোরআন শরীফের ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে পরের সূরা আগে এবং আগের সূরা পরে বা পরের রাকাতে পড়া ।
- (৩৪) জামাতে মোক্তাদীদের কষ্ট হয়, ইমামের এরকম দীর্ঘ কেরাআত পড়া ।
- (৩৫) মোক্তাদীর চাহিদা অনুযায়ী ইমামের অতি তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করা ।
- (৩৬) আস্তিন কনুইয়ের উপরে উঠিয়ে রাখা ।
- (৩৭) ফরজ নামাজে একই রাকাতে একই সূরা দুইবার পড়া ।
- (৩৮) ফরজ নামাজে অকারণে লাঠি বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ।
- (৩৯) সেজদায় যাবার সময় বিনা কারণে মাটিতে হাঁটু রাখার আগে হাত রাখা ।
- (৪০) সেজদা থেকে উঠবার সময় হাত তোলার আগেই হাঁটু ওঠানো ।
- (৪১) নামাজের আদবসমূহ পালনে অলসতা বা অবহেলা করা ।

চতুর্থ অধ্যায়

নামাজের মধ্যে যে সকল দোয়া কালাম পড়তে হয়

এবার নামাজের মধ্যে যে সকল দোয়া কালাম পড়তে হয়, সে সকল দোয়া আমাদের শিখে নেয়া প্রয়োজন।

নীচে সেগুলো লিখে দেয়া হচ্ছে। এগুলো সব মুখস্থ রাখতে হবে। কারণ নামাজে এগুলো মুখস্থই পড়তে হয়।

১। জায়নামাজে দাঁড়াবার দোয়া

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বাংলা উচ্চারণঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ্জাহিয়া লিল্লাজি ফাত্বারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওমা আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থঃ আমি সকল কিছু থেকে মন ও মুখ সেই মহান আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ফিরিয়ে নিলাম, যিনি আসমান এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা- আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

২। তকবীর

اللَّهُ أَكْبَرُ -

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহ্‌ আকবর।

অর্থ : আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

৩। হানা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ -

বাংলা উচ্চারণঃ সোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওতাআ'লা জাদ্দুকা ওয়া-লা-ইলাহা গইরুক্‌।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার নাম মহান।
তোমার পরাক্রম ও সম্মান সুউচ্চ এবং তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই, যার সামনে
মাথা নত করা যেতে পারে।

৪। তায়্যাজ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

বাংলা উচ্চারণ : আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রজিম।

অর্থ: বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি একমাত্র আল্লাহরই সাহায্য
প্রার্থী।

৫। তাসমিয়াহ্

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

বাংলা উচ্চারণ : বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম

অর্থ : পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করলাম।

৬। রুকুর তসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ -

বাংলা উচ্চারণ : সোবহানা রব্বিইয়াল আজিম।

অর্থ : আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

৭। রুকু থেকে মাথা উঠাবার সময়ের দোয়া

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ -

বাংলা উচ্চারণ : সামিআ'ল্লাহ্ লিমান হামিদাহ্।

অর্থ : আল্লাহ্‌তায়ালার শোনে প্রশংসাকারীর প্রশংসা।

৮। রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার পরের দোয়া

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

বাংলা উচ্চারণ : রব্বানা লাকাল হামদ্।

অর্থ : হে আল্লাহ্ আমি তোমার প্রশংসা করি।

৯। সেজদার তসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

বাংলা উচ্চারণ: সোবহানা রব্বিইয়াল আ'লা।

অর্থ: আমার মহান প্রভু পবিত্রতম।

১০। তাশাহুদ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَسْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

বাংলা উচ্চারণ: আতাহিইয়াতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্ তুইয়িবাতু।
আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।
আসসালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহিন। আশহাদু আল্-লা-
ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহু।

অর্থ: সকল আত্মিক ইবাদত, শারীরিক ইবাদত এবং আর্থিক ইবাদত, শুধুমাত্র আল্লাহুতায়ালার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি অনন্ত শান্তি, রহমত এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহুতায়ালার সৎ বান্দাদের প্রতিও সীমাহীন শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই এবং আমি একথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হজরত মোহাম্মদ স. তাঁর বান্দা এবং রসুল।

১১। দরুদ শরীফ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ - اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুহুমা ছল্লি আলা মোহাম্মাদিঁও ওয়া ‘আলা আলি মোহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আ’লা ইব্রাহিমা ওয়া আ’লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুহুমা বারিক আ’লা মোহাম্মাদিঁও ওয়া আ’লা আলি মোহাম্মাদিন কামা বারকতা আ’লা ইব্রাহিমা ওয়া আ’লা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি হজরত মোহাম্মদ স. এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, যেমন রহমত বর্ষণ করেছো হজরত ইব্রাহিম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং মহান। হে আমাদের আল্লাহ্! হজরত মোহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করো, যেমন অনুগ্রহ বর্ষণ করেছো হজরত ইব্রাহিম এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি। হে মহিমময়, নিশ্চয়ই সকল প্রকার প্রশংসা তোমারই।

১২। দোয়া মাসুরাহ

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ
الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ
وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ -

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুহুমা ইন্নি জলামতু নাফসি জুলমান কাসীরাঁও ওয়ালা ইয়াগফিরুয় যুনূবা ইন্না আন্তা ফাগ্ফিরলি মাগফিরাতাম্ মিন ইনদিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রহীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি এবং তুমি ছাড়া ক্ষমাকারী তো কেউ নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।

১৩। সালাম

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ -

বাংলা উচ্চারণঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।

অর্থঃ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক।

উপরোক্ত দোয়া কালাম ছাড়াও নামাজে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হয়। এছাড়া ফরজ নামাজের প্রথম দু’রাকাতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে যে কোনো একটি সূরা মিলাতে হয়। সূরাগুলোও আবার ধারাবাহিকভাবে পাঠ করা প্রয়োজন, যেমনঃ কোরআন শরীফে একটার পর একটা সাজানো আছে। একটা সূরা পড়ার পর, পরের রাকাতে মাঝের সূরা বাদ দিতে চাইলে কম পক্ষে দুটো সূরা বাদ দিয়ে পড়তে হবে।

এখন সূরা ফাতেহা এবং ১০টি সূরা ধারাবাহিকভাবে লিখে দেয়া হলো।
সূরাগুলি মুখস্থ করে নিতে হবে। কমপক্ষে দুটি সূরাতো মুখস্থ থাকতেই হবে।
নাহলে নামাজই পড়া সম্ভব হবে না।

কয়েকটি সূরা

১। সূরা ফাতেহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

বাংলা উচ্চারণঃ আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন, আর রহমানির রহীম,
মালিকি ইয়াওমদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন। ইহ্‌দিনাস্
সিরাভুল মুস্তাকীম, সিরাভুল লাজীনা আনআ'মতা আলাইহিম, গইরিল মাগদূবি
আলাইহিম ওয়ালাদল্লীন। (আমিন) আমিন সূরার সঙ্গে সংযুক্ত নয়।

অর্থঃ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি দয়াময়,
পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু
তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, তাদের পথ, যাদেরকে
তুমি অনুগ্রহ করেছো, তাদের পথে নয় যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

২। সূরা ফীল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَ تَرَّ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ
يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ
طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ۝
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّعْكُولٍ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ আলাম তারা কাইফা ফাআ'লা রব্বুকা বি আস্হা-বিল্ ফীল, আলাম ইয়াজ্ আল কাইদাহুম ফী তাদদীল। ওয়া আরসালা আলাইহিম তুইরান আবাবীল। তারমী-হিম বিহিজারতিম মিন সিজ্জীল। ফাজা আলাহুম কা আসফিম মা'কুল।

অর্থঃ তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক হস্তী অধিপতিদেরকে কি করেছিলেন? তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি বাঁকে বাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন, যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিলো প্রস্তর কংকর। অবশেষে তিনি তাদেরকে করে দিয়েছিলেন ভক্ষিত ঘাসের মতো।

৩। সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا يَلْفِ قَرِيْشٍ ۝ الْفِهُمُ رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ
۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ
جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ লিইলাফি কুরাইশ, ইলাফিহিম রিহ্লাতাশ শিতাই ওয়াস্‌সইফ। ফাল ইয়া'বুদু রব্বা হাজাল বাইত, আল্লাজী আত্বআ'মাহুম মিন জুয়িওঁ ওয়া-আমানাহুম মিন খওফ।

অর্থঃ যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে ভ্রমণের শীত ও গ্রীষ্মকালে। অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের, যিনি তাদেরকে আহার দিয়েছেন ক্ষুধার এবং দিয়েছেন নিরাপত্তা ভীতি থেকে।

৪। সূরা মাউন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّنِّ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
الْيَتِيْمَ ۝ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهَوْنَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَءَوْْنَ ۝ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ আরাআইতাল্লাজী ইউকাজ্জিবু বিদ্দীন। ফাজা-লিকাল্লাজী ইয়াদুয়ুল ইয়াতিম, ওয়ালা ইয়াহুদু আ'লা ত্বা'মিল মিসকীন। ফাওয়াইলুল লিল্ মুসল্লীন। আল্লাজীনাহুম আ'ন সলাতিহিম সাহ্ন। আল্লাজীনাহুম ইউরাউনা ওয়া ইয়ামনা উনাল মা-উন।

অর্থঃ তুমি কি তাকে দেখেছো, যে কর্মফল দিবসের প্রত্যাখ্যানকারী? সে তো সেই ব্যক্তি, যে রূঢ়ভাবে এতমকে বিতাড়নকারী এবং অভাবগ্ৰস্তকে খাদ্যদানে অনুৎসাহী। সুতরাং সেই নামাজীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা নামাজে উদাসীন এবং লোক দেখানোই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তারা গৃহস্থালীর ছোট খাট প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে বিরত থাকে।

৫। সূরা কাওছার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ ইন্না আ'ত্বইনা কাল কাওছার, ফাসল্লি লি রব্বিকা ওয়ানহার, ইন্না শা-নিয়াকাহুয়াল আব্‌তার।

অর্থঃ আমি অবশ্যই আপনাকে কাওছার দান করেছি। সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করো এবং কোরবানী করো। নিশ্চয় তোমার শত্রুরাই তো নাম-নিশানাবিহীন।

৬। সূরা কাফিরুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ
عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا
أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন, লা-আ'বুদু মা-তা'বুদুন, ওয়ালা-আনতুম আ'বিদূনা মা-আ'বুদ। ওয়ালা আনা আ'বিদুম্ মা আ'বাত্তুম ওয়ালা আনতুম আ'বিদূনা মা আ'বুদ। লাকুম দী-নুকুম ওয়ালিয়া-দ্বীন।

অর্থঃ বলো, হে কাফেররা! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদত করো না যার ইবাদত আমি করি এবং আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা করো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদত করো না যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।

৭। সূরা নাসর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

বাংলা উচ্চারণঃ ইজা-জ্বা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্। ওয়ারা আইতান্নাসা ইয়াদখুলুনা ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহ্। ইন্নাহ্ কা-না তাওউয়া-বা।

অর্থঃ আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় যখন আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী।

৮। সূরা লাহাব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ
وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝
وَأَمْرُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ
مِّن مَّسَدٍ ۝

নামাজের নিয়ম/৬৫

বাংলা উচ্চারণঃ তাব্রাত ইয়াদা আবী লাহাবিউ ওয়া তাব্র। মা-আগুনা আনুহ্
মালুহ্ ওয়ামা কাসাব্, সাইয়াস্লা নারন্ জা-তা লাহাবিওঁ ওআমরআতুহ্,
হাম্মালাতাল হাতুব্, ফী-জ্বী-দিহা হাবলুম্ মিম্ মাসাদ।

অর্থঃ ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার
ধন-সম্পদ এবং তার উপার্জন কোনো কাজে আসে নাই। সত্ত্বর সে দন্ধ হবে লেলিহান
আগুনে এবং তার ইন্ধন বহনকারিণী স্ত্রীও-তার গলায় দেয়া হবে পাকানো রশি।

৯। সূরা ইখলাস্

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ কুল্ হুওয়াল্লাহ্ আহাদ্। আল্লাহুস্‌সমাদ। লাম ইয়ালিদ
ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহ্ কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ বলো তিনিই আল্লাহ্, একক, অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন।
সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি
এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

১০। সূরা ফালাক্

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ
فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ কুল আউজু বিরব্বিল ফালাক্। মিন শাররি মা খ'লাক্।
ওয়ামিন শাররি গ-সিক্বিন ইজা ওক্বাব। ওয়ামিন শাররি ন্নাফ্‌ফাছ্‌আতি ফিল ওক্বাদ।
ওয়ামিন শাররি হা-সিদ্‌ইজা হাসাদ।

অর্থঃ বলো, আমি শরণ গ্রহণ করছি উম্মার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। গভীর আঁধারে আচ্ছন্ন রাতের অনিষ্ট থেকে এবং ওই সকল রমণীদের অনিষ্ট থেকে যারা গ্রহীতে ফুঁ দেয় এবং হিংসুকের হিংসা থেকে, যখন সে হিংসা করে।

১১। সূরা নাস্

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ
النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي
يُؤَسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْغَيْتِ
وَالنَّاسِ ۝

বাংলা উচ্চারণঃ কুল আউজু বিরব্বিন্নাস্ - মালিকিন্নাস্ - ইলাহিন্নাস্, মিন্ শাররিল ওয়াস্ওয়াসিল্ খন্নাস্, আল্লাজী ইউ ওয়াস্বিসু ফী- সুদূরিন্নাস্, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস্।

অর্থঃ বলো, আমি শরণ গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের মাবুদের, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, চাই সে জ্বীন হোক অথবা মানুষ।

পঞ্চম অধ্যায়

নামাজ আদায়ের নিয়ম

নিম্নলিখিত নিয়মে নামাজ পড়তে হবেঃ-

জায়নামাজে কেবলামুখী হয়ে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং জানা থাকলে জায়নামাজে দাঁড়ানোর দোয়া পড়তে হবে।

তারপর কোন্ ওয়াক্তের কি নামাজ পড়া হচ্ছে তা মনে মনে খেয়াল করে নিতে হবে। এটাকেই নিয়ত করা বলে। এরপর দুই হাত দুই কান বরাবর তুলে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে নাভি বরাবর বাম হাত রেখে ডান হাতের বৃদ্ধা এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কজ্জি পেঁচিয়ে ধরে বাকী তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের উপর বিছিয়ে রাখতে হবে। এরকম করাকে তকবীরে তাহরীমা বলে। খেয়াল রাখতে হবে কান বরাবর হাত তুলবার সময় যেনো দুই হাতের তালু কেবলামুখী থাকে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো যেনো স্বাভাবিকভাবে খোলা থাকে।

হাত বাঁধবার পর প্রথমে ছানা পড়তে হবে। তারপর ‘আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বুনির্ রজীম’ পড়তে হবে, তারপর বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়ে সূরা ফাতেহা পড়া শুরু করতে হবে। সূরা ফাতেহা পড়া শেষ হলে কোরআন শরীফের যে কোনো একটি বড় আয়াত কিংবা তিনটি ছোট আয়াত অথবা যে কোনো একটি ছোট সূরা পড়তে হবে।

সূরা পড়া শেষে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে রুকুতে যেতে হবে। এ সময় দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের হাঁটু চেপে ধরতে হবে। হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেনো দুই হাত এবং দুই পা টান টান সোজা থাকে এবং মাথা, পিঠ ও পার্শ্বদেশ সমান্তরাল থাকে। এই অবস্থার নাম রুকু করা। রুকু অবস্থায় তিন/পাঁচ/সাত বার ‘সোবহানা রব্বিইয়াল আজীম’ পড়তে হবে। একে রুকুর তস্বী বলে। জামাতে ইমামতি করলে ইমাম কমপক্ষে পাঁচ বার রুকুর তস্বী পড়বেন।

তস্বী পড়া শেষে ‘সামিআ’ল্লাহু লিমান হামিদাহ্’ বলে সোজা হয়ে দুই হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর পড়তে হবে ‘রব্বানা লাকাল হামদ’।

তারপর ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে সোজাসুজি সেজদায় যেতে হবে। সেজদায় যাবার সময় প্রথমে দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং সবশেষে কপাল মাটিতে রাখতে হবে। দুই হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রে মিলিয়ে রাখতে হবে। দুই হাতের মাঝখানে মুখ ও মাথা রাখতে হবে। দুই হাতের কজির উপরের অংশ মাটিতে লাগানো যাবে না। পায়ের নিম্নাংশ থেকে উরু এবং উরু থেকে বগল ও পেট এবং পেটও বগল থেকে হাত আলাদা রাখতে হবে। পায়ের আঙ্গুলগুলো যথাসম্ভব কেবলামুখী করে ভাঁজ করে পায়ের দুই পাতা একত্রে মিলিয়ে রাখতে হবে। সেজদা অবস্থায় তিন/পাঁচ/সাতবার সেজদার তস্বী ‘সোবহানা রব্বিইয়াল আ’লা’ পড়তে হবে। জামাতের ইমাম কমপক্ষে পাঁচবার তস্বী পড়বেন। তস্বী পড়া শেষে ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে উঠে বসতে হবে। বসবার সময় ডান পা খাড়া করে রাখতে হবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো ভাঁজ করে যথাসম্ভব কেবলামুখী করে রাখতে হবে এবং বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর স্থির হয়ে বসতে হবে। এ অবস্থায় কমপক্ষে একবার তস্বী পড়ার পরিমাণ সময় অপেক্ষা করতে হবে। এ অবস্থায় সামান্য সময় (একবার তস্বী ‘সোবহানালাহ্’ পড়ার পরিমাণ সময়) স্থির হয়ে বসে পুনরায় আল্লাহ্ আকবর বলে সেজদায় যেতে হবে।

সেজদায় আগের নিয়মে তস্বী পড়ে আল্লাহ্ আকবর পড়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। উঠবার সময় প্রথমে মাথা, তারপর নাক, তারপর দুই হাত এবং সবশেষে দুই হাঁটু ওঠাতে হবে। এবার নামাজ এক রাকাত শেষ হলো।

সেজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আগের নিয়মে হাত বেঁধে দ্বিতীয় রাকাত শুরু করতে হবে। প্রথমে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়ে নিয়ে সূরা ফাতেহা, তারপর একটি সূরা পড়া শেষ করে ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে রুকুতে যেতে হবে এবং রুকুর তস্বী পড়া শেষে আগের মতোই ‘সামিআ’ল্লাহ্ লিমান হামিদাহ্’ বলে দাঁড়িয়ে ‘রব্বানা লাকাল হামদ’ বলে এক তস্বী পরিমাণ সময় অপেক্ষা করে ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে সেজদায় যেতে হবে। তারপর আগের নিয়মে দুই সেজদা করে স্থির হয়ে বসতে হবে। এবার নামাজ দুই রাকাত শেষ হলো।

এবার বসা অবস্থায় তাশাহুদ পড়তে হবে। নামাজ যদি তিন বা চার রাকাতের হয়, তবে তাশাহুদ পড়েই আবার ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে আগের নিয়মে নামাজ পড়তে হবে।

তিন বা চার রাকাত নামাজ শেষ করে নিয়ে পুনরায় বসতে হবে। দুই রাকাত নামাজ হলে প্রথম বৈঠকে এবং তিন বা চার রাকাত নামাজ হলে দ্বিতীয় বৈঠকে প্রথমে তাশাহুদ, তারপর দরুদ শরীফ, তারপর দোয়া মাছুরা পড়ে ডানে একবার এবং বাঁয়ে একবার ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্’ বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

পুরুষ ও মহিলাদের নামাজের পার্থক্য

উপরে পুরুষদের নামাজ আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।
মেয়েদের নামাজের সঙ্গে পুরুষ মানুষের নামাজের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। এ
সম্পর্কে নীচে বর্ণনা করা হলো।

১। তকবীরে তাহরীমা (প্রথম তকবীর):

পুরুষঃ প্রথম তকবীর উচ্চারণের সময় পুরুষেরা দুই হাত কান বরাবর
তুলবে। পুরুষেরা নামাজ বিশেষে জোরে বা চুপে চুপে তকবীর উচ্চারণ করতে
পারে।

মহিলাঃ প্রথম তকবীর উচ্চারণের সময় মেয়েরা দুই হাত কাঁধ বরাবর
তুলবে। কাপড়ের ভিতর থেকে হাত বের করবে না। তকবীরে তাহরীমার পর বাম
হাত বুকে রেখে তার উপরে ডান হাত আলতো করে রেখে নামাজ শুরু করবে।
দোয়া, সূরা ইত্যাদি পুরুষদের মতোই পড়বে। কিন্তু কোনো কিছুই জোরে শব্দ
করে পড়তে পারবে না।

২। পোশাকঃ

পুরুষঃ সতর ঢাকা থাকে এবং শালীনতা বজায় থাকে এরকম পরিচ্ছন্ন
পোশাকে পুরুষরা নামাজ পড়বে।

মহিলাঃ মেয়েদের সকল শরীরই সতর। মাথার চুল ঢাকা রাখতে হবে এবং
মুখমণ্ডল বাদে সকল শরীর নামাজ পড়বার সময় ঢাকা থাকতে হবে। শাড়ী দিয়ে
সকল শরীর ঢাকা যায় না, তাই চাদর দিয়ে সকল শরীর ঢেকে নিতে হবে। গলা,
হাত, চুল সহ সকল শরীরই ঢাকতে হবে।

৩। কেরাআতঃ

পুরুষঃ পুরুষেরা নামাজ বিশেষে জোরে বা চুপে চুপে সূরা কেরাআত পড়তে
পারে।

মহিলাঃ মেয়েরা নামাজে কোনো অবস্থাতেই জোরে শব্দ করে সূরা কেরাআত
দোয়া কালাম পড়তে পারবে না। নামাজে উঠা বসার সময় ‘আল্লাহু আকবর’ও
চুপে চুপে পড়তে হবে। জোরে পড়তে পারবে না।

৪। কেয়ামঃ

পুরুষঃ দাঁড়ানোর সময় পুরুষের দুই পা কমপক্ষে চার আঙ্গুল, বেশী পক্ষে
বারো আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রেখে দাঁড়াবে।

মহিলাঃ মেয়েরা পা ফাঁক রেখে দাঁড়াতে পারবে না। দুই পায়ের পাতা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। সব ওয়াক্তের ফরজ নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। অন্যান্য নামাজ বসে পড়তে পারে। বসে নামাজ পড়লে অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়।

৫। রুকু :

পুরুষঃ রুকুর সময় পুরুষের হাত, পা, ফাঁক রেখে দুই হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরে রুকু করবে। মাথা, পিঠ, পাছা সমান্তরাল হতে হবে।

মহিলাঃ রুকুর সময় দুই হাত শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে ঝুঁকে পড়ে দুই হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে হাঁটু স্পর্শ করে রুকু করতে হবে। পুরুষদের মতোই রুকুতে তস্বী পড়তে হবে। কিন্তু শব্দ করে পড়তে পারবে না।

৬। সেজদা :

পুরুষঃ সেজদার সময় পুরুষেরা পূর্বে বর্ণিত নিয়মে সোজাসুজি সেজদায় যাবে এবং সেজদায় সব অঙ্গগুলোকে একে অপর থেকে আলাদা রাখবে। শুধুমাত্র পা দু'টো একসঙ্গে মিলিত থাকবে। হাতের কজির উপরের অংশও মাটি থেকে উপরে উঠিয়ে রাখবে।

মহিলাঃ মেয়েরা শরীরের সব অঙ্গ একসাথে মিলিয়ে রেখেই সেজদায় যাবে এবং সেজদা অবস্থাতেও জড়োসড়ো হয়ে সব অঙ্গ একত্রে মিলিয়ে হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে সেজদা করবে।

৭। বৈঠক :

পুরুষঃ বসার সময় ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখতে হবে এবং আঙ্গুলগুলো ভাঁজ করে, কেবলামুখী করে রাখতে হবে।

মহিলাঃ দুই পা ডান দিকে বের করে দিয়ে পাছার উপর বসতে হবে। সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে। নামাজ শেষে মোনাজাতের সময়ও কাপড়ের নীচে হাত রেখে মোনাজাত করতে হবে।

নামাজের জামাত

জামাতবদ্ধ হয়ে ফরজ নামাজ পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া জামাতে হাজির না হওয়া অনুচিত। একাকী নামাজ অপেক্ষা জামাতের নামাজের ফজিলত সাতাশ গুণ বেশী। যদি কোনো ব্যক্তি জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়ে দেখতে পায়, জামাত শেষ হয়ে গিয়েছে। তবু সে জামাতের সওয়াব পাবে।

স্থান বিশেষে নামাজের সওয়াব নিম্নরূপঃ—

১. ঘরে বা দোকানে ----- ১ গুণ
২. ওয়াক্ফিয়া মসজিদে----- ২৫ গুণ
৩. জামে মসজিদে ----- ৫০০ গুণ
৪. মসজিদে আকছায় ----- ১,০০০ গুণ
৫. মসজিদে নববীতে ----- ৫০,০০০ গুণ
৬. কাবা শরীফে ----- ১,০০,০০০ গুণ

এই প্রসঙ্গে আরো কিছু নিয়ম জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমনঃ

১. প্রস্রাব পায়খানার বেগ অবস্থায় জামাতে যাওয়া উচিত নয়। এরকম করা মাকরুহ।

২. রুগ্ন ব্যক্তির জন্য জামাত জরুরী নয়।

৩. ক্ষুধার্ত অবস্থায় সামনে খানা হাজির হলে জামাত ছেড়ে দিতে পারে।

৪. পীড়িত ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি যদি জামাতে গেলে রোগীর কষ্ট হয় বা ভয় পায়, তবে জামাত ছেড়ে দেয়া যাবে।

৫. প্রচণ্ড শীতের সময় মসজিদে গেলে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে তবে ঘরে একাকী বা জামাত করে নামাজ পড়া যাবে।

৬. কোন স্থানে সফরে রওয়ানা হবার সময় মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে গেলে যদি ট্রেন, বাস, লঞ্চ ফেল করার সম্ভাবনা থাকে, তবে জামাত তরক করা যায়।

৭. মসজিদে গেলে যদি ঘরের বা দোকানের মাল-সামান চুরি যাওয়ার আশংকা থাকে তবে জামাত ছেড়ে দেয়া যায়।

৮. মহিলাদের জামাতে যোগদান করা উচিত নয়।

৯. মসজিদে একবার আজান ও জামাত হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার জামাত করা মাকরুহ। তবে আজান এবং একামত না দিয়ে মসজিদের একপাশে বা বারান্দায় জামাত করা যায়।

১০. মানুষ ডেকে ডেকে নফল নামাজের জামাত করা মাকরুহ। তবে আজান ও একামত ছাড়া মসজিদের কিনারায় সর্বোচ্চ তিনজন মিলে জামাত করতে পারবে। এর বেশী হলে মাকরুহ হবে।

ইমামের যোগ্যতা ও দায়িত্ব

ঐ ব্যক্তিই ইমাম হবার যোগ্য, যিনি নামাজের নিয়ম কানুন সবচেয়ে বেশী জানেন এবং বিশুদ্ধভাবে নামাজে কোরআন শরীফ পাঠ করতে পারেন।

এই ব্যাপারে আরো জেনে রাখা প্রয়োজন যে—

১. দুই ব্যক্তি যদি নামাজের মাসায়েল সম্পর্কে সমান জ্ঞান রাখেন তবে তাদের মধ্যে যিনি ইলমে কেরাআত বেশী জানেন, তিনিই ইমাম হবেন।
২. কেরাআতেও যদি দুইজন সমান হন, তবে যিনি বেশী পরহেজগার বা ধর্মভীরু— তিনি ইমাম হবেন।
৩. পরহেজগারীতেও সমান হলে, যার বয়স বেশী তিনি ইমাম হবেন।
৪. বয়স সমান হলে যার স্বভাব চরিত্র সুন্দর তিনিই ইমামতি করবেন।
৫. স্বভাব চরিত্রে সমান হলে যিনি অধিকতর ভদ্র তিনি ইমামতি করবেন এবং ভদ্রতায় সমান হলে অপেক্ষাকৃত সুশ্রী চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিই ইমাম হবেন।
৬. কোনো বাড়ীতে নামাজের জামাত হলে বাড়ীর মালিক ইমামতিতে অগ্রগণ্য হবেন। তিনি অনুপযুক্ত হলে উপযুক্ত ব্যক্তি ইমামতিতে দাঁড়াবেন।
৭. কোনো মসজিদে যদি এমন ব্যক্তি উপস্থিত হন, যিনি ঐ মসজিদের নির্দিষ্ট ইমাম অপেক্ষা ইমামতিতে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন, তথাপিও ঐ মসজিদের নির্দিষ্ট ইমামের ইমামতিই উত্তম।
৮. অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুমকারীর চেয়ে জানাবাতের তায়াম্মুমকারীর অধিকার বেশী।
৯. ইমাম নামাজ গুরুত্ব পূর্বে নামাজীদের কাতার সোজা হলো কিনা, দেখবেন।
১০. ইমাম নামাজ লম্বা করবেন না।

যে ইমামের পিছনে নামাজ বৈধ

১. তায়াম্মুমকারীর পিছনে অজুকারীর নামাজ জায়েজ।
২. মোজা মাসেহকারীর পিছনে পূর্ণাঙ্গ অজুকারীর নামাজ জায়েজ।
৩. উপবিস্ত ব্যক্তির পিছনে দাঁড়ানো ব্যক্তির নামাজ জায়েজ।
৪. ফরজ নামাজ পাঠকারীর পিছনে নফল নামাজ পাঠকারীর নামাজ জায়েজ।
৫. তারাবীর নামাজে বালকের ইমামতি জায়েজ।

যে ইমামের পিছনে নামাজ জায়েজ নয়

১. ফাসেক এবং দ্বীনের হুকুম আহকাম পালনে উদাসীন ব্যক্তি।
২. বেদাতী শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ প্রচলনকারী ব্যক্তি।
৩. যে ব্যক্তি দাড়ি ছেটে এক মুষ্টির কম পরিমাণ করে রাখে।

৪. শিয়া ও খারেজী মতবাদের অনুসারী ব্যক্তি।

৫. মওদুদী মতবাদের অনুসারী ব্যক্তি।

ইমাম এবং মোক্তাদীর অবস্থানঃ

ইমামের অনুসরণে যারা নামাজ আদায় করে তাদেরকে মোক্তাদী বলে। এ সম্পর্কে জেনে রাখা দরকার যে—

১. মোক্তাদী একজন হলে ইমামের ডান পাশে এমনভাবে দাঁড়াবে যেনো মোক্তাদীর পায়ের আঙ্গুল ইমামের পায়ের গোড়ালী বরাবর থাকে।

২. যদি দুইজন হয়— তবে দুইজনই ইমামের ঠিক পিছনে দাঁড়াবে। যদি দুইজন ইমামের দুইপাশে দাঁড়ায় তবে মাকরুহ্ তানযিহি হবে।

৩. তিন বা ততোধিক ব্যক্তি হলেও ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তিন ব্যক্তি ইমামের দুইপাশে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে মাকরুহ্ তাহরিমী হবে।

৪. ইমামের ঠিক পিছনে ঐ রকম ব্যক্তিরই দাঁড়ানো উচিত যারা নামাজের মাসায়েল সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ।

৫. ইমাম সম্পূর্ণরূপে মেহরাবের মধ্যে দাঁড়াবে না। পা মেহরাবের বাইরে থাকলে রুকু সেজদা যদি মেহরাবের ভিতরে হয়, তবে অসুবিধা নেই।

৬. ইমামের ঠিক পিছন থেকে মোক্তাদীদেরকে নামাজের কাতার শুরু করতে হবে।

৭. সামনের কাতারে জায়গা থাকতেও পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরুহ্।

৮. ইমাম মোক্তাদীর চেয়ে কমপক্ষে এক হাত পরিমাণ উচু অথবা নীচু জায়গায় দাঁড়াতে পারবে না। তবে তার সঙ্গে যদি কমপক্ষে দুইজন মোক্তাদী থাকে তবে মাকরুহ্ হবে না।

ইমামের পিছনে মোক্তাদীর করণীয়

১. মোক্তাদী সব ব্যাপারে ইমামের অনুসরণ করবে।

২. কোনো কাজ ইমামের আগে করতে পারবে না।

৩. ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা এবং অন্য কোনো সূরা বা কোরআনের আয়াত পড়া মোক্তাদীদের জন্য নিষেধ।

৪. ইমাম তাকবীরে তাহরীমা জোরে শব্দ করে বলবেন। মোক্তাদী ইমামের পরপরই চুপে চুপে তাকবীরে তাহরীমা বলবে।

৫. ইমাম শব্দে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে রুকুতে গেলে মোক্তাদী চুপে চুপে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে রুকুতে যাবে।

৬. ইমাম রুকু থেকে দাঁড়াবার সময় ‘সামিআ’ল্লাহু লিমান হামিদাহ্’ বললে মোক্তাদী রুকু থেকে দাঁড়িয়ে চুপে চুপে ‘রব্বানা লাকাল হামদ’ উচ্চারণ করবে।

৭. মোক্তাদীদেরকে ছানা, রুকুর তস্বী, সেজদার তস্বী, তাশাহুদ, দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পড়তে হবে এবং ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্’ বলে ইমামের সঙ্গে সঙ্গে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

৮. সালাম শেষে মোক্তাদী ইমামের দোয়া বা অন্য কোনো আমলের অনুসরণ করতে বাধ্য নয়।

৯. ইমাম নামাজের কোনো রোকনে ভুল করলে মোক্তাদী জোরে ‘আল্লাহু আকবর’ উচ্চারণ করে ইমামকে সাবধান করে দিবে।

১০. ইমাম মোক্তাদীর লোকমা (সংশোধনী) গ্রহণ করে ভুল শুদ্ধ করে নিবেন।

১১. ইমাম সূরা ফাতেহায় অথবা ফাতেহা পাঠ শেষে ফরজ পরিমাণ কেরাআত পাঠে ভুল করলে মোক্তাদী জোরে শুদ্ধ কেরাআত উচ্চারণ করে ইমামের ভুল সংশোধন করে দিবেন।

১২. ইমাম মোক্তাদীর সংশোধনী (লোকমা) শুনে নিজের কেরাআত শুদ্ধ করে নিবেন।

১৩. এই ভুল ফরজ পরিমাণের (কমপক্ষে তিন আয়াত) মধ্যে হলে ইমাম সোহ্ সেজদা দিবেন। সোহ্ সেজদায় মোক্তাদীও ইমামকে অনুসরণ করবেন।

১৪. কেরাআতের ভুল ফরজ পরিমাণের পরে হলে ইমাম মোক্তাদীর সংশোধনী গ্রহণ করতে পারবেন অথবা সংশোধনী গ্রহণ না করে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে রুকুতে যেয়ে নামাজ পাঠ করতে পারবেন। এরজন্য তাকে সোহ্ সেজদা দিতে হবে না।

১৫. ইমাম যদি ভুলক্রমে ছেড়ে দেয়, তবে মোক্তাদীও সেগুলো ছেড়ে দিবে—নামাজের মধ্যে এরকম বস্তু ৫টি। যেমনঃ

(১) ঈদের নামাজের তকবীর (২) নামাজের প্রথম বৈঠক (৩) তেলাওয়াতের সেজদা (৪) সোহ্ সেজদা এবং (৫) বিতির নামাজের শেষ রাকাতের দোয়া কুনুত।

১৬. ইমাম ইচ্ছা করে বা ভুল করে আদায় করলেও মোক্তাদীরা আদায় করবে না—নামাজের মধ্যে এরকম কাজ ৪ টি যেমনঃ

(১) ইমাম যদি নামাজের নির্দিষ্ট সেজদা ছাড়া অতিরিক্ত সেজদা করে (২) ঈদের নামাজে নির্দিষ্ট ছয় তকবীরের বেশী তকবীর বলে (৩) জানাযার নামাজে যদি চারবার তকবীর বলার পরেও আবার তকবীর বলে (৪) নামাজের শেষ বৈঠকে না বসে যদি ইমাম দাঁড়িয়ে যায়।

১৭. নামাজের মধ্যে এরকম ছয়টি কাজ আছে, যা ইমাম ছেড়ে দিলেও মোক্তাদীগণ আদায় করে নিবে। সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) তাহরীমার সময় হাত উঠানো (২) ছানা পড়া (৩) রুকু ও সেজদায় তকবীর (৪) রুকু ও সেজদায় তসবীহ (৫) তাশাহুদ (৬) শেষ বৈঠকের সালাম ফিরানো।

লাহেক এবং মাসবুক সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

লাহেকঃ

কোনো ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে নামাজ শুরু করবার পর যদি নামাজের মধ্যে তার অজু নষ্ট হয়ে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে নামাজ ছেড়ে দিতে হবে। সেই ব্যক্তি যদি ঐ অবস্থায় কালবিলম্ব না করে অজু করে এসে পুনরায় নামাজের জামাতে শরীক হয় তবে তাকে লাহেক বলা হবে।

এ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যে,

১. অজু করার সময় নামাজের কোনো অংশ বাদ পড়ে যাওয়ার কারণেই এইরূপ ব্যক্তিকে লাহেক বলা হয়।

২. লাহেক ব্যক্তির যে কয় রাকাত বাদ পড়ে যায়, সে কয় রাকাত নামাজের শেষে ইমামের সালাম ফিরানোর পর পড়ে নিতে হবে।

৩. বাদ পড়া রাকাতগুলো আদায় করার সময় মোক্তাদীকে কেরাআত পড়তে হবে না।

৪. যদি অজু শেষ করে জামাতে সামিল হওয়ার আগেই ইমাম নামাজ শেষ করে থাকেন, তবে বাকী নামাজ লাহেক ব্যক্তি একা একাই পড়ে নিবে। এ অবস্থাতেও তাকে কেরাআত পড়তে হবে না।

৫. অজু নষ্ট হওয়ার আগে এক বা একাধিক রাকাত পড়ে থাকলে সেগুলো পুনরায় পড়তে হবে না। অজু নষ্ট হওয়ার পরে যে কয় রাকাত বাদ পড়ে যায় শুধু সে কয় রাকাত পুনঃ পড়তে হবে এবং কেরাআত ছাড়া পড়তে হবে।

মাসবুকঃ

কোনো ব্যক্তি জামাতে শরীক হওয়ার আশায় যদি মসজিদে বা অন্য কোনো স্থানে এসে দেখে নামাজ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ইতিমধ্যে এক বা একাধিক রাকাত হয়েও গিয়েছে, তখন কোনো ব্যক্তি জামাতে শরীক হলে তাকে মাসবুক বলা হয়।

এ রকম ক্ষেত্রে নামাজ আদায়ের নিম্নবর্ণিত নিয়মগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন—

১. এক ব্যক্তি ফজরের নামাজের জামাতে এসে দেখলো ইমাম প্রথম রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাত পড়ছেন— তখন তাকে জামাতের কাতারে দাঁড়িয়ে

ইমামের এজ্জদার নিয়ত করে (আমি এই ইমামের এজ্জদা করলাম একথা স্মরণ করে) তকবীরে তাহরীমা বলে জামাতে শরীক হতে হবে। এ সময় সে ছানা, আউজুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ কোনো কিছুই পড়বে না।

২. দ্বিতীয় রাকাত শেষে ইমামের সালাম ফিরানো হয়ে গেলে সে উঠে দাঁড়িয়ে বাকী এক রাকাতে ছানা, আউজুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতেহা এবং কেরাআত পড়ে রুকু, সেজদা, তাশাহ্হুদ, দরুদ শরীফ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামাজ পূর্ণ করবে। আর ইমামের শেষ বৈঠক পেলে সালাম শেষে স্বাভাবিক নিয়মে বাকী দুই রাকাত আদায় করে নিতে হবে।

৩. যদি কোনো ব্যক্তি জোহরের নামাজের এক রাকাত হওয়ার পর জামাতে শরীক হয়, তখন ইমামের অনুসরণের কারণে সেই ব্যক্তি তার দ্বিতীয় রাকাতে বসতে পারবে না এবং তাশাহ্হুদও পড়ার সুযোগ পাবে না। তৃতীয় রাকাতে যখন সে বসার সুযোগ পাবে তখন শুধু তাশাহ্হুদ পড়বে এবং ইমামের সালাম ফিরানো হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে না পাওয়া রাকাত ছানা, আউজুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতেহা এবং কেরাআত, রুকু, সেজদা, তাশাহ্হুদ, দরুদ শরীফ এবং দোয়া মাছুরাসহ শেষ করবে।

৪. আর যদি দুই রাকাত পর জামাতে शामिल হয়, তবে একই নিয়মে বাকী দুই রাকাত নামাজ জামাতের নামাজ শেষে আদায় করতে হবে। এ অবস্থায় তাকে জামাতের শেষ বৈঠকে শুধু তাশাহ্হুদ পড়তে হবে এবং তার বাদ পড়া প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার পর কেরাআতও সংযুক্ত করতে হবে। কারণ বাদ পড়া প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার পর কেরাআতও ফরজ ছিলো।

৫. আর যদি তিন রাকাত পর জামাতে শরীক হয়, তবে মাসবুক ব্যক্তি শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়বে না। কেননা তখনও তার দুই রাকাত নামাজ হয়নি। আর নামাজ দুই রাকাত না হলে বসাও যায় না। তাশাহ্হুদও পড়া যায় না। কিন্তু এখন সে ইমামের অনুসরণের কারণে এক রাকাত পড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। ইমাম সালাম ফিরানোর পর সে উঠে দাঁড়িয়ে এক রাকাত পড়েই বসে যাবে। এখন তার দুই রাকাত হওয়ায় তাকে বসতে হবে এবং তাশাহ্হুদ পড়তে হবে। তাশাহ্হুদ শেষে যথা নিয়মে বাকী দুই রাকাত পড়ে নিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে। বাদ পড়ে যাওয়া তিন রাকাতের যে কোনো দুই রাকাতে তাকে সূরা ফাতেহার সঙ্গে কেরাআতও পড়ে নিতে হবে। কারণ বাদ পড়ে যাওয়া তিন রাকাতের মধ্যে দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে কেরাআত পড়া ফরজ ছিলো।

৬. যদি সালাম ফিরানোর আগে শেষ বৈঠকে জামাতে शामिल হয়, তবে ইমামের সালাম ফিরানোর পর চার রাকাত নামাজই যথা নিয়মে আদায় করতে হবে।

৭. জোহরের মতো আসর এবং এশার জামাতেরও একই নিয়ম। কারণ এই তিন ওয়াক্তের নামাজই চার রাকাতবিশিষ্ট।

৮. মাগরিবের নামাজের এক রাকাত হয়ে যাওয়ার পর নামাজে শরিক হলে জামাত শেষে ছুটে যাওয়া রাকাত সূরা ফাতেহা ও কেরাআতসহ আদায় করতে হবে। এরকম অবস্থায় মাসবুক ব্যক্তি যখন তার প্রথম রাকাত শেষে ইমামের সঙ্গে বসতে বাধ্য হবে, তখন তাশাহুদ পড়বে না।

৯. মাগরিবের নামাজের দুই রাকাত পর শামিল হলে জামাত শেষে এই দুই রাকাত সূরা ফাতেহা এবং কেরাআতসহ আদায় করতে হবে। এরকম অবস্থায় জামাত শেষে এক রাকাত পড়ে নিয়ে বসে তাশাহুদ পড়তে হবে এবং তাশাহুদ শেষে বাকী রাকাত পড়ে শেষ বৈঠকের করণীয় শেষ করে সালাম ফিরাতে হবে। লক্ষণীয় বিষয়, এরকম অবস্থায় তিন রাকাত নামাজের জন্য মোজাদীকে তিনবার বসতে হয়। প্রথম বার ইমামের এজাদায় বাধ্য হওয়াতে। দ্বিতীয়বার তার দুই রাকাত নামাজ শেষ হওয়ায় এবং তৃতীয় বার শেষ বৈঠক হওয়ায়। এরকম অবস্থায় প্রথম বৈঠকে মোজাদী তাশাহুদ পড়বে না। পরের বৈঠকগুলোতে পড়বে।

সুতরা

নামাজী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা শক্ত গোনাহ। তাই খোলা ময়দানে নামাজ পড়তে গেলে সামনে আড়াল রাখতে হয়। এটাকেই সুতরা বলে।

এ সম্পর্কে এই কথাগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন।

১. খোলা ময়দানে নামাজ পড়লে সামনে ডান চোখ বরাবর কমপক্ষে এক হাত লম্বা লাঠি বা ছড়ি পুঁতে রাখতে হবে। পুঁতে রাখা না গেলে ফেলে রাখতে হবে।

২. লাঠি, ছড়ি না থাকলে উঁচু কোনো জিনিস সামনে রেখে দিতে হবে যাতে বাহিরের লোকের যাতায়াত চোখে না পড়ে।

৩. নামাজ পড়াকালীন সময় সেজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এভাবে দৃষ্টি রাখলেও সেজদার স্থানের সামনেও কিছুদূর স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি যায়। এই দৃষ্টিসীমার বাইরে দিয়ে লোক চলাচল করলে কোনো ক্ষতি হবে না।

৪. কেউ সামনে দিয়ে যেতে থাকলে ‘সোবহানাল্লাহ্’ বলে তাকে সাবধান করে দিতে হবে।

৫. অথবা হাত দিয়ে অথবা হাতের ইশারায় তাকে ঠেকাতে হবে। এরকম করলে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না।

৬. নামাজরত অবস্থায় নামাজীর ঠিক সামনে কেউ বসে থাকলে সেই ব্যক্তি ডানে বা বামে উঠে যেতে পারবে। এতে কোনো দোষ নেই।

৭. কোনো ব্যক্তি সুনত নামাজরত অবস্থায় যদি ফরজ নামাজের জামাত শুরু হয়ে যায় এবং তার সামনের কাতারে ঠিক তার সামনের স্থান খালি থাকে তবে ডান, বাম বা পিছন থেকে কোনো ব্যক্তি এসে তার সামনের শূন্য স্থানে দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। এতে কোনো দোষ নেই।

বিত্তির নামাজ

প্রতিদিন এশার নামাজের পর পরই দুই রাকাত সুনত নামাজ পড়ে নিয়ে তিন রাকাত বিত্তির নামাজ পড়তে হয়। এই নামাজ ওয়াজিব।

বিত্তির নামাজ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো নীচে উল্লেখ করা হলো।

১. বিত্তির নামাজের সময় এশার নামাজের পর থেকে সোবহে সাদেক পর্যন্ত। অর্থাৎ ফজরের নামাজের ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত বিত্তির নামাজ পড়া যায়। হজরত রসুলেপাক স. শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ শেষ করে বিত্তির নামাজ পড়তেন। কখনো কখনো এশার নামাজের পর প্রথম রাতেই পড়তেন।

২. যারা তাহাজ্জুদ নামাজে অভ্যস্ত নন, তারা প্রথম রাতেই এশার ফরজ ও সুনত পড়ে নিয়ে বিত্তির নামাজ পড়বেন।

৩. নামাজের শুরুতে “আমি বিত্তির নামাজ পড়ছি” এই রকম খেয়ালে নিয়ত করতে হবে।

বিত্তির নামাজ পড়ার নিয়মঃ-

৪. প্রথম রাকাতে তকবীরে তাহরীমা বলে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে ছানা, আউজুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতেহা এবং একটি সূরা বা কোরআন শরীফের কিছু অংশ পড়ে নিয়ে যথারীতি রুকু, সেজদা করে নিতে হবে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর আর একটি সূরা পড়তে হবে। রুকু সেজদার পর বসে তাশাহুদ পড়তে হবে। তৃতীয় রাকাতেও সূরা ফাতেহার সঙ্গে আর একটি সূরা পড়তে হবে। তারপর ‘আল্লাহু আকবর’ বলে দুই হাত উঠিয়ে পুনরায় হাত বেঁধে দাঁড়াতে হবে। তারপর দোয়া কুনুত পড়ে যথানিয়মে রুকু সেজদা করে নিয়ে শেষ বৈঠকের তাশাহুদ, দরুদ শরীফ, দোয়া মাসুরা শেষ করে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে। দোয়া কুনুত নীচে লিখে দেওয়া হলো।

৫. বিত্তির নামাজের তৃতীয় রাকাতে দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজেব।

৬. ভুলক্রমে যদি কেউ দোয়া কুনুত না পড়ে রুকুতে চলে যায়, তবে রুকু থেকে দাঁড়িয়ে- দাঁড়ানো অবস্থায় দোয়া কুনুত পড়ে নিবে। দোয়া কুনুত পড়া শেষে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে সেজদায় চলে যাবে এবং যথানিয়মে সোহ সেজদা করে নিয়ে নামাজ শেষ করবে। নামাজের তরতীব (ধারাবাহিকতা) রক্ষা করা ওয়াজেব। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হয়েছে বলেই সোহ সেজদা করতে হবে।

৭. ভুলক্রমে দোয়া কুনুত না পড়েই যদি কেউ নামাজ শেষ করতে চায়, তবে তাকেও সোহ্ সেজদা দিয়ে নিতে হবে। কারণ দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজেব। আর নামাজের এক বা একাধিক ওয়াজেব বাদ পড়লে সোহ্ সেজদা দিয়ে নিলে নামাজ সংশোধিত হয়ে যায়।

৮. যতদিন না দোয়া কুনুত মুখস্থ হয়, ততদিন দোয়া কুনুতের বদলে ‘রব্বানা আতিনা ফিদ্বুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বীনা আজাবান্নার’ পড়বে। অথবা ‘আল্লাহুম্মাগ ফিরলী’ ৩ বার অথবা ‘ইয়া রব্বি’ তিনবার পড়বে। আর ইতিমধ্যে দোয়া কুনুত মুখস্থ করার চেষ্টা করবে। দোয়া কুনুত মুখস্থ করতেই হবে। কারণ বিতির নামাজে দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজিব।

৯. রমজান মাসে দোয়া কুনুত জামাতবদ্ধ অবস্থায় পড়া যায়।

দোয়া কুনুত :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ - وَنَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَقْجُرُكَ - اَللّٰهُمَّ
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نَصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعِي
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ -

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তায়ীনুকা ওয়া নাসতাগ-ফিররুকা ওয়ানু‘মিনুবিকা, ওয়ানা তাওয়াক্কালু আলাইকা, ওয়া নুছনী আ‘লাইকাল খইর। ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা, ওয়া নাখ লাউ ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফ জুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়ালাকা নুসল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস্আ’, ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রহমাতাকা ওয়া নাখশা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্ব।

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট সাহায্যপ্রার্থী, ক্ষমাপ্রার্থী, আপনার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং আপনার উপর আশ্বশীল। আমরা আপনার সং প্রশংসা করি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা আপনার অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। যারা আপনার অবোধ আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করি এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করি। হে আল্লাহ! আমরা কেবল আপনারই

এবাদত করি। কেবল আপনার জন্যই নামাজ পড়ি, আপনার উদ্দেশ্যেই সেজদাবনত হই, আপনার নৈকট্য লাভের জন্য সাধনায় লিপ্ত হই। আপনারই সামনে হাজির হই। আপনার রহমত প্রাপ্তির আশায় থাকি। আর আপনার আজাবের ভয়ে ভীত হই, যদিও জানি আপনার আজাব কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট।

বিতির নামাজের পর

বিতির নামাজের পর হজরত রসুলেপাক স. দুই রাকাত নামাজ ছোট করাআতের সঙ্গে বসে পড়তেন। এই দুই রাকাত নামাজের ফজিলত অত্যধিক।

এ সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যে—

১. এই দুই রাকাত নামাজ পড়লে তাহাজ্জুদ নামাজের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

২. শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাই রসুলেপাক স. এই দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিতে উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন, যাতে তাহাজ্জুদ নামাজের বরকত সকলে লাভ করতে পারে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের পর দুই রাকাত নামাজ পড়তেন বসে, যাতে সূরা ইজা জুলজিলাত ও কুলইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন পড়তেন। (মেশকাত)।

৩. এই দুই রাকাত নামাজ বসে পড়াই উত্তম বরণ সুন্নত। কারণ রসুলেপাক স. এই দুই রাকাত নামাজ অধিকাংশ সময় বসেই পড়তেন।

৪. বিতির নামাজের সালাম ফিরানোর পর পরই এই নামাজ শুরু করতে হবে।

৫. নামাজ শুরুর আগে তিন বার ‘সোবহানালা মালিকিল কুদ্দুস’ পড়বে। শেষ বার সামান্য শব্দ করে পড়বে।

৬. নামাজের শুরুতে ‘আমি তস্বীহাতুল বিতরের নামাজ পড়ছি’, এরকম খেলালে নিয়ত করবে।

৭. নামাজে ছোট ছোট সূরা পড়তে হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সম্পর্কে পুনরালোচনা

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিয়ম কানুন সম্পর্কে পুনরায় ধারাবাহিকভাবে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। তাতে করে আমাদের এতক্ষণের আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত, সহজ এবং স্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

১। ফজরের নামাজ

সোবহে সাদেকের শুরু থেকে সূর্যোদয় শুরু পর্যন্ত ফজর নামাজ পড়ার সময়। বছরের বিভিন্ন সময়ে এই নামাজের সময় সীমা কিঞ্চিৎ বাড়ে কমে। সংযুক্ত সময়সূচী দেখলেই এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা যাবে।

এ সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলো জেনে রাখতে হবে। যেমন—

১. ফজরের নামাজ মোট চার রাকাত। দুই রাকাত সুন্নত এবং দুই রাকাত ফরজ।

২. সুন্নত দুই রাকাত ফরজের আগে পড়তে হবে।

৩. সুন্নত নামাজ ঘরে পড়ে ফরজ জামাতের সঙ্গে পড়া উচিত।

৪. সুন্নত মসজিদে গিয়েও পড়া যায়।

৫. মসজিদে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, ফরজ নামাজের জামাত শুরু হয়ে গেছে তবে তৎক্ষণাৎ চিন্তা করে দেখতে হবে যে, দুই রাকাত সুন্নত পড়ে জামাতে শরীক হওয়া যাবে কিনা। যদি ইমামের সালাম ফিরানোর আগে জামাতে শরীক হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় তবে সংক্ষেপে বারান্দায় বা মসজিদের এক কোণে সুন্নত পড়ে নিয়ে জামাতে শরীক হবে।

৬. যদি সুন্নত পড়তে গেলে জামাত শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সুন্নত নামাজ না পড়ে জামাতে शामिल হবে এবং সূর্য উঠার পর সুন্নত নামাজ আদায় করে নিবে।

৭. ‘আমি ফজরের সুন্নত নামাজ পড়ছি’ নামাজের আগে এরকম খেয়াল করলেই সুন্নত নামাজের নিয়ত হয়ে যাবে।

৮. ফজরের নামাজ একা পড়লে ‘আমি ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়ছি’, এ রকম খেয়াল করলেই ফরজ নামাজের নিয়ত হয়ে যাবে।

৯. তকবীরে তাহরীমা বলার আগে নিয়ত ঠিক করতে হয়।

১০. জামাতে নামাজ পড়লে ‘আমি এই ইমামের এক্তেদা (অনুসরণ) করলাম’ একথা মনে রাখলেই নিয়ত হয়ে যাবে।

১১. ফজরের জামাত শেষে ইমাম নামাজীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবেন এবং মোনাজাত করবেন। নামাজীরাও মোনাজাতে শরীক হবেন। মোনাজাত শেষে সূর্যোদয় পর্যন্ত মোরাকাবায় বসে থাকা উচিত। এ সময় কথা বলা মাকরুহ।

১২. যদি কারো জরুরী কাজ থাকে, তবে তিনি ইমামের সালাম ফিরানোর পর পরই কাজে চলে যেতে পারবেন। এতে কোনো দোষ হবে না।

১৩. ঘুমন্ত অবস্থাতেই যদি কারো ফজরের সময় পার হয়ে যায়, তবে তিনি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যে কোনো সময়ে ফজরের নামাজ পড়ে নিতে পারবেন। তবে কোনো কাজ শুরুর আগেই নামাজ আদায় করে নেয়া উচিত। দ্বিপ্রহরের মধ্যে নামাজ আদায় করলে ‘কাজা পড়ছি’ এরকম নিয়ত করতে হবে না। দুপুরের মধ্যে নামাজ আদায় করলে সুন্নত, ফরজ উভয় নামাজই পড়তে হবে। কোনো কারণবশতঃ যদি জোহরের ওয়াক্ত এসে যায়, তবে শুধু ‘ফরজ দুই রাকাত কাজা পড়ছি’ নিয়তে পড়তে হবে এবং এই নামাজ জোহরের নামাজের আগেই পড়তে হবে।

১৪. ফজরের শেষ সময়ে যদি ঘুম ভাঙ্গে তবে দেখতে হবে যে, সূর্যোদয় শুরু হলে আগে সুনুত এবং ফরজ পড়ে শেষ করা যাবে কিনা। যদি শুধু মাত্র দুই রাকাত নামাজ পড়ার সময় হাতে থাকে তবে শুধু ফরজ পড়ে নিবে।

১৫. যদি ফরজ পড়ার সময়ও হাতে না থাকে, তবে বসে সূর্যোদয় শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং সূর্যোদয় শেষ হলে সুনুত ও ফরজ দুই নামাজই পড়ে নিবে। সংযুক্ত সময়সূচী দেখলেই বছরের বিভিন্ন সময়ের সূর্যোদয়ের শুরু ও শেষ সম্পর্কে জানা যাবে। মনে রাখতে হবে, সূর্য উদয় শুরু এবং শেষ সময়ের মধ্যে নামাজ পড়া হারাম।

২। জোহরের নামাজ

সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লেই জোহরের নামাজের সময় শুরু হয়। ছায়া আসলী (ঠিক দ্বিপ্রহরে যে ছায়া থাকে) বাদে যতক্ষণ না কোনো বস্তুর ছায়া সেই বস্তুর দ্বিগুণ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জোহরের সময় থাকে।

জানা প্রয়োজন যে –

১. জোহরের নামাজ মোট দশ রাকাত। ফরজের আগে চার রাকাত সুনুত পড়তে হয়। তারপর চার রাকাত ফরজ পড়তে হয়। ফরজ শেষে দুই রাকাত সুনুত পড়তে হয়।

২. মসজিদে গিয়ে যদি দেখে ফরজ নামাজের জামাত শুরু হয়ে গেছে অথবা এতক্ষণ সময় হাতে আছে যার মধ্যে চার রাকাত সুনুত পড়ে শেষ করা যায় না। তখন সুনুত চার রাকাত পড়বে না। প্রথমে জামাতের সঙ্গে ফরজ পড়বে।

৩. জামাত শেষে দুই রাকাত সুনুত পড়বে। তারপর পূর্বের চার রাকাত সুনুত আদায় করে নিতে পারবে।

৪. ফরজ নামাজের পরে লম্বা মোনাজাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। ফরজ নামাজ শেষ করে নীচে লেখা দোয়া পড়ে নিয়েই সুনুত নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।

হাদিস শরীফে উল্লেখ করা আছে–

‘রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরাবার পর এই দোয়া পরিমাণ সময়ের বেশী বসতেন না।

আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়ামিন কাস্ সালাম তাবারকতা ইয়া জাল জ্বালালি ওয়াল ইকরাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, শান্তি তোমারই কাছ থেকে। তুমি বরকতময়, হে পরাক্রম ও মহাসম্মানের অধিকারী।

৩। আসরের নামাজ

জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে আসরের নামাজের সময়সীমার তারতম্য ঘটে। সময়সূচী দেখলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ সম্পর্কে যা জানা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছেঃ

১. আসরের নামাজ চার রাকাত। চার রাকাতই ফরজ।

২. এই ওয়াক্তে কোনো সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ নেই।

৩. ইচ্ছা করলে আসরের ফরজের আগে চার রাকাত সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা নামাজ পড়া যায়। না পড়লে কোনো দোষ নেই।

৪. এই চার রাকাত সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা নামাজের নিয়ম কিছুটা স্বতন্ত্র। দুই রাকাত পড়ার পর শুধু তাশাহ্‌হুদ পড়লে হবে না। তাশাহ্‌হুদের পর দরুদ শরীফ এবং দোয়া মাছুরাও পড়তে হবে। তারপর সালাম না ফিরিয়ে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে সূরা ফাতেহার সঙ্গে আর একটি করে সূরা পড়ে বাকী দুই রাকাত নামাজ শেষ করতে হবে।

৫. আসর নামাজের পর মাগরিব পর্যন্ত কোনো প্রকার নফল নামাজ পড়া যাবে না।

৬. জোহর কাজা থাকলে আসরের আগেই কাজা আদায় করে নিতে হবে।

৪। মাগরিবের নামাজ

মাগরিব নামাজের সময় সূর্য ডোবার পর থেকে শুরু হয়। এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় ধরে মাগরিবের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে। সময় সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে গেলে সময়সূচী দেখে নেয়া যেতে পারে।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে—

১. মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত ফরজ এবং দুই রাকাত সুন্নত।

২. ফরজ নামাজের পরে ‘আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়ামিন কাস্ সালাম তাবারকতা ইয়া জাল জ্বালালি ওয়াল ইকরাম’ মোনাজাত করেই সুন্নত নামাজ শুরু করতে হবে।

৩. মাগরিবের নামাজ ছোট সূরা দিয়ে পড়তে হয়।

৪. ফরজ মসজিদে জামাতে পড়ে সুন্নত ঘরে এসেও পড়া যায়। মসজিদেও পড়া যায়।

৫. যদি আসর কাজা থাকে, তবে মাগরিবের নামাজের ফরজের আগেই কাজা পড়ে নিতে হবে।

৫। এশার নামাজ

মাগরিবের নামাজের পর থেকেই এশা শুরু হয়। সোব্‌হে সাদেক পর্যন্ত এই সময় স্থায়ী থাকে।

জানা প্রয়োজন যে—

১. বিনা কারণে অর্ধরাত্রির পর এশার নামাজ পড়া মাকরুহ্। ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কিছু পরেই এশার নামাজ পড়ে নেয়া উচিত।

২. এশার নামাজ চার রাকাত ফরজ এবং ফরজ শেষে দুই রাকাত সুন্নত।

৩. ফরজ শেষে ‘আল্লাহুমা আনতাস্ সালাম ওয়ামিন কাস্ সালাম তাবারকতা ইয়া জাল জ্বালালি ওয়াল ইকরাম’— এই মোনাজাত পড়তে হবে।

৪. মোনাজাত শেষ হওয়ার পর পরই সুন্নত পড়তে হবে। এই দুই রাকাত সুন্নত নামাজ ঘরে এসেও পড়া যায়। মসজিদেও পড়া যায়।

৫. সুন্নত শেষে বিতির পড়তে হবে এবং বিতির শেষে বসে দুই রাকাত নামাজ পড়া খুবই ফজিলতের কাজ।

৬. এশার ফরজের আগে চার রাকাত সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কাদা নামাজ পড়া যায়। পড়লে ছওয়াব আছে না পড়লে গোনাহ্ নেই। নামাজ পড়ার নিয়ম আসরের গায়ের মোয়াক্কাদা নামাজের মতো।

এতক্ষণ ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নত নামাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। জানা প্রয়োজন যে, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজই শরীয়তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর যে ব্যক্তি নিজেকে স্থাপন করতে পারে, সে দ্বীনের উপরে দৃঢ়ভাবে কায়েম রয়েছে বলতে হবে।

এছাড়া আরো কিছু এমন নামাজ আছে যেগুলো আদায় করাও জরুরী। কিন্তু প্রতিদিন এ সকল নামাজ পড়তে হয় না। এ সব নামাজের মধ্যে জুমআর নামাজ, তারাবী নামাজ, ঈদুল ফিতরের নামাজ, ঈদুল আজহার নামাজ, জানাজার নামাজ অন্যতম। এখন একে একে এই নামাজগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জুমআর নামাজ

জুমআর নামাজ ফরজে আইন। হাদিস শরীফে জুমআর নামাজের বিশেষত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন—

১। সপ্তাহের সাতটি দিনের মধ্যে জুমআর দিনই শ্রেষ্ঠ।

২। হজরত আদম আ. এর জন্ম, বেহেশতে প্রবেশ, দুনিয়ায় আগমন— জুমআর দিনেই হয়েছে।

৩। জুমআর দিনেই কেয়ামত হবে।

৪। জুমআর রাতের ফযীলত শবে কদর অপেক্ষাও বেশী।

৫। জুমআর দিনে এমন একটি সময় আছে, যে সময় মোমেন বান্দা আল্লাহ পাকের কাছে যা চায়, তাই পায়।

৬। জুমআর দিনে বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করা উচিত। রসুলেপাক স. এরকম নির্দেশই দিয়েছেন।

৭। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার দিনের চেয়ে জুমআর দিনের মর্যাদা বেশী।

৮। জুমআর রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির কবর আজাব হয় না।

৯। জুমার রাত নূরে ভরা রাত। জুমআর দিন নূরে ভরা দিন।

জুমআর নামাজের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার আছে। নীচে সে সকল উল্লেখ করা হলো।

১। জুমআর দিন জোহরের নামাজের বদলে জুমআ পড়তে হয়।

২। মুসাফিরের উপরে জুমআ ফরজ নয়। কিন্তু মুসাফির ব্যক্তি জুমআ পড়ে নিলে তাকে আর জোহর পড়তে হবে না।

৩। অসুস্থ বা বৃদ্ধ ব্যক্তি, ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের উপরে জুমআ ফরজ নয়।

৪। জোহরের নামাজের ওয়াক্তে জুমআ পড়তে হবে। আগে পরে পড়লে নামাজ হবে না।

৫। শহর, শহরতলী, ছোট শহর বা শহরতুল্য বড় গ্রামে জুমআর নামাজ পড়া ফরজ। ছোট ও বিচ্ছিন্ন গ্রাম, বিরাণ মাঠ অথবা নদী, সমুদ্রে, জাহাজে বা নৌকায় জুমআর নামাজ না পড়ে জোহরের নামাজ পড়তে হবে।

৬। নামাজের আগে খোতবা পড়তে হবে।

৭। খোতবা জোহরের ওয়াক্তের ভিতরে হতে হবে।

৮। খোতবার শুরু থেকে নামাজের শেষ পর্যন্ত কমপক্ষে তিনজন নামাজী উপস্থিত থাকতে হবে।

৯। সর্বসাধারণের অবাধে প্রবেশের অধিকার থাকে— এরকম স্থানে জুমআ পড়তে হবে।

১০। অন্ধ ব্যক্তির উপর জুমআ ফরজ নয়। খোঁড়া ব্যক্তির উপরেও জুমআ ফরজ নয়। তবে তারা যদি ইচ্ছা করে জুমআ পড়ে তবে নামাজ হয়ে যাবে। তাদেরকে আর জোহরের নামাজ পড়তে হবে না।

১১। কোনো উপযুক্ত ওজরের (কারণের) জন্য কেউ জুমআর নামাজ না পেলে তাকে একাকী জোহর পড়তে হবে।

জুমআর দিনের করণীয়

জুমআর নামাজের জন্য ঈদের নামাজের মতোই প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্‌পাক জুমআর দিনকে ঈদের দিনের মর্যাদা দান করেছেন।

মনে রাখতে হবে যেঃ

১। জুমআর দিন গোসল করা সুন্নত।

২। যদি জুমআর দিন এবং ঈদের দিন একই দিনে পড়ে তবে একবার গোসল করলেই জুমআ ও ঈদের গোসল হয়ে যাবে। গোসলের পবিত্রতা নিয়েই জুমআ পড়া উচিত।

৩। যদি গোসল করার পর কোনো কারণে পুনরায় অজু করতে হয়, তবুও জুমআর গোসলের ফজিলত পাওয়া যাবে।

৪। জুমআর আজান শোনার সাথে সাথে দুনিয়ার কাজকর্ম বন্ধ রেখে মসজিদের দিকে রওয়ানা হতে হবে।

৫। জুমআর দিনে উত্তম পোশাক পরা, খোশবু ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

৬। সাদা পোশাক ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

খোত্বা প্রসঙ্গ

খোত্বা অর্থ ভাষণ। কিন্তু এই ভাষণ অন্য কোনো ভাষণের মতো নয়। এই ভাষণ জিকির ও এবাদত হিসাবে গণ্য। খোত্বা পড়া ফরজ এবং মনোযোগ দিয়ে খোতবা শোনা ওয়াজিব। খোত্বা ছাড়া জুমআ নামাজ হয় না।

খোত্বার মধ্যে যে সকল কাজ সুন্নত তা হচ্ছে—

- ১। দাঁড়িয়ে খোত্বা পড়তে হবে।
- ২। পর পর দুইটি খোত্বা পড়তে হবে।
- ৩। খোত্বা পাঠকারীকে দুই খোত্বার মাঝখানে ৩ বার সোবহানাল্লাহ পড়া যায় এই পরিমাণ সময় বসতে হবে।
- ৪। অজু গোসলের প্রয়োজন থেকে মুক্ত থাকতে হবে।
- ৫। নামাজীদের দিকে মুখ রেখে খোত্বা পড়তে হবে।
- ৬। খোত্বা আরম্ভ করবার আগে চুপে চুপে আউজুবিল্লাহ পড়ে নিতে হবে।
- ৭। উচ্চস্বরে খোত্বা বলতে হবে।
- ৮। খোত্বার মধ্যে ৮টি বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে। সেগুলো হচ্ছে— আল্লাহর শোকর গোজারী, আল্লাহর প্রশংসা, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য, দরুদ শরীফ, কিছু সৎ উপদেশ, কোরআন শরীফের কিছু অংশ আবৃত্তি, দ্বিতীয় খোতবায় বর্ণিত বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি এবং মুসলমানদের জন্য দোয়া কামনা।
- ৯। খোত্বা সংক্ষিপ্ত করতে হবে।
- ১০। মিসরের উপরে দাঁড়িয়ে খোত্বা বলতে হবে। মিসর না থাকলে লাঠি, ধনুক বা তলোয়ারে ভর দিয়ে খোত্বা বলা যায়।
- ১১। খোত্বা আরবী ভাষায় হতে হবে।
- ১২। শ্রোতাগণ মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে খোত্বা শুনবেন।

খোত্বা প্রসঙ্গে আরো কিছু নিয়ম কানুন জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমন—

- ১। ইমাম যখন খোত্বা পড়তে দাঁড়াবেন, তখন থেকে খোত্বার শেষ পর্যন্ত নামাজ পড়া অথবা কথাবার্তা বলা মাকরুহ তাহরিমী।
- ২। অবশ্য যে ব্যক্তির সেইদিনের ফজরের নামাজ কাজা থাকে সেই ব্যক্তি তার কাজা আদায় করে নিতে পারবেন। বরং তার কাজা আদায় করে নেয়া জরুরী।
- ৩। খোত্বার সময় শ্রোতাদের জন্য পানাহার, হাঁটাচলা, সালাম বিনিময়, তসবীহ পাঠ, মাসআলা বলা হারাম। অবশ্য ইমাম প্রয়োজনবোধে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং কোনো জরুরী মাসআলা প্রসঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

৪। যিনি খোত্বা পড়বেন তিনি নামাজও পড়বেন। যদি অন্য কেউ নামাজ পড়ান, তবুও জায়েজ হবে।

৫। কেতাব দেখে খোত্বা পড়া জায়েজ। না দেখে মুখস্থ খোত্বা বলাও জায়েজ।

৬। খোত্বার মধ্যে যেখানে হজরত রসুলেপাক স. এর নাম উচ্চারিত হবে, সেখানে মনে মনে দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

৭। দুই খোত্বার মাঝখানে হাত উঠিয়ে দোয়া পড়া মকরুহ তাহরিমী। তবে হাত না উঠিয়ে মনে মনে দোয়া করা যায়।

৮। দ্বিতীয় খোত্বায় আহলে বায়েত, সাহাবায়ে কেরাম, উম্মাহাতুল মোমেনীনগণের জন্য, বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হজরত হামযা রা. ও হজরত আব্বাস রা. এর জন্য দোয়া করা মোস্তাহাব। নিজ দেশের মুসলমান রাষ্ট্রনায়কের জন্য দোয়া করা যায়। কিন্তু তার অযথা প্রশংসা করা মাকরুহ তাহরিমী।

৯। খোত্বা শুনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, এরকম সকল প্রকার কাজ খোত্বার সময় হারাম। মসজিদের দান বাস্তব ও এ সময় নামাজীদের সামনে হাজির করা যাবে না।

১০। সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ পড়তে পড়তে যদি খোত্বা শুরু হয়ে যায়, তবে সংক্ষেপে নামাজ শেষ করবে।

১১। যদি কেউ নামাজের শেষ বৈঠকে এসেও নামাজে শরীক হয়, তবে জুমআর নামাজ পেয়েছে মনে করতে হবে। সালাম ফিরানোর পর মসজিদে পৌঁছলে অথবা জুমআর নামাজ না পেলে তাকে জোহরের নামাজ পড়তে হবে।

১২। স্থান সংকীর্ণ হলে নামাজীরা তাদের সামনের কাতারের নামাজীর পিঠের উপর সেজদা করতে পারবে।

জুমআর নামাজ কতো রাকাতঃ-

জুমআর নামাজ মোট বার রাকাত পড়তে হয়। খোত্বার আগে ‘কাবলাল জুমআ’ পড়ছি এই নিয়তে চার রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা, খোত্বার পর জামাতবদ্ধ অবস্থায় দুই রাকাত ফরজ এবং ফরজ নামাজ শেষে প্রথমে চার রাকাত বা’দাল জুমআ এবং পরে দুই রাকাত সুন্নাতুল ওয়াজ্ত নামাজ পড়তে হবে। ফরজের পর নামাজী ইচ্ছা করলে প্রথমে দুই রাকাত এবং পরে চার রাকাত পড়তে পারবেন। শেষে এই চার রাকাত নামাজও সুন্নতে মোয়াক্কাদা।

জুমআর নামাজ পড়ার নিয়ম

নির্দিষ্ট সময়ে ইমাম মিম্বরে গিয়ে বসবেন। তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে মোয়াজ্জিন দ্বিতীয়বার আজান দিবেন। আজান শেষে ইমাম দাঁড়িয়ে খোত্বা শুরু করবেন। প্রথম খোত্বা শেষে ইমাম কিছুক্ষণের জন্য মিম্বরে বসে পড়বেন। তারপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খোত্বা বলবেন।

নামাজীরা যথাসম্ভব ইমামের দিকে মুখ করে মনোযোগ সহকারে খোত্বা শুনবেন। খোত্বা শেষে মোয়াজ্জিন একামত শুরু করবেন। নামাজীরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন। ইমাম নামাজের দুই রাকাতেই সশব্দে কেরাআত পড়বেন। সালাম ফিরানোর পর সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করবেন। মোনাজাতের পর পরই সবাইকে মোট ছয় রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ পড়ে নিতে হবে।

ঈদুল ফিতরের নামাজ

রমজান মাসে পূর্ণ একমাস রোজা রাখার পর শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখ সকালের দিকে ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়তে হয়। ঈদুল ফিতরের নামাজ ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতরের নামাজ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিয়ম কানুনগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন।

১। ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য আজান এবং একামত দিতে হয় না।

২। ঈদুল ফিতরের নামাজ দুই রাকাত।

৩। আমি ঈদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ পড়ছি, এই কথা খেয়াল করে নামাজের নিয়ত করতে হবে। মোক্তাদীগণ ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য এই ইমামের এজ্জেদা (অনুসরণ) করলাম— এরকম খেয়ালে নিয়ত করবেন।

৪। দুই রাকাত নামাজে যে কয়বার তকবীর পড়তে হয়, তার চেয়ে আরো ছয়টি অতিরিক্ত তকবীর বলতে হবে। তিন তকবীর প্রথম রাকাতে এবং তিন তকবীর দ্বিতীয় রাকাতে।

৫। নামাজের পর ইমাম নামাজীদের দিকে মুখ করে খোত্বা পড়বেন। ঈদুল ফিতরের খোত্বা পড়া সুন্নত। শোনা ওয়াজিব।

৬। খোত্বা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। এ সময় কথাবার্তা বলা, চলাফেরা করা, নামাজ পড়া অথবা দোয়া করা সবই হারাম।

৭। জুমআর নামাজের মতো ঈদুল ফিতরের খোত্বাও দুই দফায় বলতে হবে। ইমাম দুই খোত্বার মাঝে কিছুক্ষণ বসবেন। দুই খোত্বাই তকবীর বলে শুরু করতে হবে। প্রথম খোত্বায় ৯ বার এবং দ্বিতীয় খোত্বায় ৭ বার তকবীর বলতে হবে।

ঈদুল ফিতরের দিন ১৩ টি কাজ সুনুত।

যেমন- (১) শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে যথাসম্ভব সুসজ্জিত হওয়া (২) গোসল করা (৩) মেছওয়াক করা (৪) উত্তম পোশাক পরিধান করা (৫) খোশবু ব্যবহার করা (৬) খুব ভোরে বিছানা থেকে উঠা (৭) ফজরের নামাজের পরে বেশী বিলম্ব না করে ঈদগাহে যাওয়া (৮) ঈদগাহে যাওয়ার আগে খোরমা বা অন্য কোনো মিষ্ট দ্রব্য আহার করা (৯) ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ফিতরা আদায় করা (১০) ঈদের নামাজ মসজিদে না পড়ে ঈদগাহে পড়া (১১) এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরে আসা (১২) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া (১৩) নিম্নলিখিত তকবীর আস্তে আস্তে বলতে বলতে যাওয়া।

ঈদের তকবীরঃ

اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ - لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ
الْحَمْدُ-

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহ্ আকবর আল্লাহ্ আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্ আকবর আল্লাহ্ আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ার নিয়ম

নামাজের শুরুতে নিয়ত করে ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে নাভি বরাবর হাত বাঁধতে হবে। তারপর ছানা পড়তে হবে। ছানা পড়া শেষ হলে পর পর তিনবার ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলবার সময় দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত ছেড়ে দিতে হবে। তৃতীয় বার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে নাভির উপরে হাত বাঁধতে হবে। এই তকবীরই তকবীরে তাহরীমা। আগের তিনটি অতিরিক্ত তকবীর। তকবীরে তাহরীমার পর প্রথমে ‘আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বুনির রজীম’ পড়ে ‘বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম’ পড়তে হবে। তারপর সূরা ফাতেহা শেষ করে কোরআন শরীফের কিছু আয়াত বা সূরা পড়তে হবে। তারপর ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে রুকু করতে হবে। এরপর নিয়ম মতো রুকু সেজদা করে এক রাকাত নামাজ পূর্ণ করে দ্বিতীয় রাকাত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য আর একটি সূরা পাঠ করে তিন বার ‘আল্লাহ্ আকবর’ উচ্চারণ করতে হবে। প্রতিবারই দুই হাত কান বরাবর তুলে হাত ছেড়ে দিতে হবে। এই তিনটি তকবীরও অতিরিক্ত তকবীর। এইভাবে প্রথম রাকাতে তিনটি এবং দ্বিতীয় রাকাতে তিনটি অতিরিক্ত তকবীর ঈদের নামাজে বলা ওয়াজিব। চতুর্থ বার ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে যথানিয়মে রুকু, সেজদা, বৈঠক, তাশাহুদ, দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পড়ে নিয়ে সালাম ফিরাতে হবে। এই নিয়মেই ঈদের নামাজ পড়তে হয়।

ঈদুল আজহার নামাজ

জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে ঈদুল আজহার নামাজ পড়তে হয়। ঈদুল আজহার নামাজও ওয়াজিব। যে নিয়মে ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়তে হয় সেই নিয়মেই ছয়টি অতিরিক্ত তকবীরসহ ঈদুল আজহার নামাজ পড়তে হয়। শুধু নামাজের আগে ঈদুল ফিতরের জায়গায় ঈদুল আজহার নিয়ত করতে হবে।

এ সম্পর্কে আরো কিছু জেনে নেয়া প্রয়োজন। সেগুলো হচ্ছে—

১. ৯ই জিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ্জ আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর পর জামাতে নামাজ পাঠকারীদের জন্য তকবীরে তশরীক পড়া ওয়াজিব।

তকবীরে তশরীকঃ

আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

২. তকবীরে তশরীক উচ্চস্বরে বলা ওয়াজিব। মহিলারা চুপে চুপে বলবেন।

৩. ফরজ নামাজের সালাম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তকবীর পড়তে হবে।

৪. ইমাম তকবীর পড়ার কথা ভুলে গেলে মোক্তাদীরা উচ্চস্বরে তকবীর পড়া শুরু করবে। ইমামের অপেক্ষায় বসে থাকবে না। একা নামাজীও ফরজ নামাজ শেষে তকবীর পড়বে।

৫. ঈদুল আজহার নামাজের পরেও তকবীর বলা ওয়াজিব।

৬. যদি কেউ ঈদের নামাজ না পায়, তবে একা একা ঈদের নামাজ পড়তে পারবে না। কাজা পড়া ওয়াজিব হবে না। কারণ জামাত ছাড়া ঈদের নামাজ হয় না। তবে যদি কয়েকজন লোক নামাজ না পায়, তবে তারা জামাত করে নামাজ পড়তে পারবে। এই জামাতে পূর্ববর্তী জামাতের ইমাম ও মোক্তাদীরা শরীক হতে পারবে না।

৭. ঈদের নামাজে ইমামের তকবীর বলা শেষে কেরাআতের সময় যদি কেউ নামাজে শরীক হয় তবে অতিরিক্ত তকবীরগুলো সে একা একা পড়ে নিবে। যদি রংকু অবস্থায় জামাতে शामिल হয়, তবে একা একা তকবীর বলে নিয়ে যদি রংকুতে शामिल হতে পারে, তবে তাই করবে। আর যদি সে সম্ভাবনা না থাকে, তবে নিয়ত বেঁধে রংকুতে চলে যাবে এবং রংকু অবস্থায় বাদ পড়ে যাওয়া তকবীরগুলো বলে নিবে। কিন্তু এ অবস্থায় তকবীর বলার সময় হাত উঠাবে না। তকবীর বলা শেষে যদি সময় পায়, তবে রংকুর তস্বী পড়বে। আর যদি রংকুতে তকবীর পড়ার আগেই রংকু শেষ হয়, তবে ইমামের অনুসরণে নামাজ শেষ করে নিবে। এরকম অবস্থায় বাদ পড়ে যাওয়া তকবীর মাফ। যদি দ্বিতীয় রাকাতে কেউ জামাতে

শামিল হয়, তবে ইমামের সালাম শেষে ওঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে ছানা, আউজুবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতেহা এবং অন্য আর একটি সূরা পড়ে রুকুতে যাবার আগে অতিরিক্ত তকবীরগুলো বলে নিবে।

৮. ইমাম যদি দাঁড়ানো অবস্থায় তকবীর না বলে ভুলে রুকুতে চলে যায়, তবে রুকু অবস্থায় তকবীরগুলো বলে নিবে। রুকু ছেড়ে দাঁড়িয়ে তকবীর বলবে না। কিন্তু যদি রুকু থেকে দাঁড়িয়ে তকবীর বলে নিয়ে পুনরায় রুকুতে যায় তবে নামাজ হয়ে যাবে। লোকসংখ্যা বেশী থাকলে সোহ্ সেজদাও করতে হবে না।

ঈদুল আজহার নামাজের দিনে যে কাজগুলো সুন্নত তা হচ্ছে—

(১) যথাসম্ভব সুসজ্জিত হওয়া (২) গোসল করা (৩) মেছওয়াক করা (৪) ভালো পোশাক পরা (৫) সুগন্ধি ব্যবহার করা (৬) খুব ভোরে বিছানা থেকে ওঠা (৭) সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া (৮) নামাজের আগে কোনো কিছু না খাওয়া (এরকম করা মোস্তাহাব) (৯) ঈদগাহে নামাজ পড়া (১০) এক রাস্তায় যাওয়া অন্য রাস্তায় ফিরে আসা (১১) ঈদুল ফিতরের নামাজ যে সময়ে পড়া হয়, তার চেয়েও সকাল সকাল নামাজ পড়া (১২) নামাজের পর কোরবানী করা (১৩) ঈদগাহে যাবার পথে উচ্চস্বরে তকবীর পড়া।

তারাবীহ নামাজ

তারাবীহ নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। জামাত করে মসজিদে পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা কেফায়া। তারাবীহ নামাজের জামাত মসজিদেও হতে পারে। বাড়ীতে বা অন্য কোনো স্থানেও হতে পারে। তবে মসজিদের জামাতের ফজিলত বেশী। কেউ যদি একা একাও তারাবীহ নামাজ বাড়ীতে পড়ে তবুও নামাজ হয়ে যাবে। কোনো গোনাহ্ হবে না। কিন্তু যদি মসজিদে একেবারেই জামাত না হয়, তবে মহল্লার সবাই গোনাহ্গার হবে। যদি কিছু লোকে নিয়মিত জামাত করে, তবে অন্যরা বাড়ীতে একা একা নামাজ পড়তে পারবে। এ সম্পর্কে মোটামুটি বর্ণনা এরকম—

১. রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেলে তারাবীহ নামাজ শুরু হয়। শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে শেষ হয়। চাঁদ দেখার ভিত্তিতে কোনো রমজানে ২৯ দিন, কোনো রমজানে ৩০ দিন তারাবীহ পড়তে হয়।

২. এশার নামাজের পর, দুই রাকাত নিয়মিত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ পড়ে নিয়ে তারাবীহ নামাজ পড়া শুরু করতে হয়। তারাবীহর পর বিতির পড়তে হয়।

৩. যদি কেউ ভুলবশতঃ এশার নামাজের আগে তারাবীহ পড়ে তারপর এশা পড়ে, তবে তার নামাজ হবে না। তাকে পুনরায় এশা নামাজ পড়ে নিয়ে তারাবীহ পড়তে হবে।

৪. কিন্তু যদি ভুলে এশার আগে বিতির পড়ে ফেলে তবে বিতির এবং এশা দুই নামাজই হয়ে যাবে। কারণ বিতির এশার অধীন নয়। কিন্তু তারাবীহ এশার অধীন।

৫. তারাবীহ নামাজ মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে তারাবীহ বলে। এই হিসাবে মোট নামাজ পাঁচ তারাবীহ। প্রতি তারাবীহতে চার রাকাত নামাজ। এই হিসাবে মোট নামাজ ২০ রাকাত।

৬. দুই রাকাত পর পর সালাম ফিরাতে হয়। চার রাকাত পর পর অর্থাৎ এক তারাবীহ পর পর এক তারাবীহ পরিমাণ সময় বসে বিশ্রাম করা মোস্তাহাব। কিন্তু যদি এতো বেশী সময় বসে থাকলে মোজাদীগণের কষ্ট হয়, তবে সামান্য সময় বসলেও চলবে।

৭. এই বিশ্রামের সময় দোয়া করা, তস্বী পড়া, জিকির করা, দরুদ শরীফ পড়া সবই জায়েয। এই অবস্থায় পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই। আমাদের দেশে প্রচলিত যে দোয়া পড়তে অনেকেই অভ্যস্ত, সেই দোয়াটিও এ সময় পড়া যেতে পারে।

এই দোয়াটি তারাবীহ নামাজের দোয়া ৪-

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ
وَالْعِظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ
وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا
يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ
وَارُوحٌ -

বাংলা উচ্চারণঃ সোবহানা জিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সোবহানা জিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জুবরুত সোবহানালা মালিকিল হাইয়্যিল্লাজী লা ইয়ানামু ওয়াল্লা ইয়ামুতু আবাদান আবাদান সুব্বূহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালাইকাতি ওয়াররুহ্।

৮. ‘আমি তারাবীহ নামাজ পড়ছি’ এই রকম খেয়ালে নিয়ত করতে হবে। জামাতে দাঁড়িয়ে ‘এই ইমামের এজ্জেদা করলাম’ এই রকম নিয়ত মনে মনে করতে হবে।

৯. যদি কেউ পৃথকভাবে এশার নামাজ পড়ে এসে তারাবীহর জামাতে शामिल হয়, তবে জায়েজ হবে। কিন্তু যদি সকল লোক বাড়ীতে একা একা এশার নামাজ পড়ে নেয়, আর তারাবীহর নামাজ জামাতে পড়ে, তবে জায়েয হবে না।

১০. তারাবীহর নামাজের মধ্যে একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নত। মোক্তাদীর আলস্যের জন্য কোরআন খতম ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

১১. কিন্তু যদি ছোট সূরা দিয়ে তারাবীহর জামাত পড়া হয়, তবে তাতেও কোনো দোষ নেই।

১২. বেতন ঠিক করে তারাবীহর ইমাম নিযুক্ত করা জায়েয নেই।

১৩. প্রতি দুই রাকাতে কেরআত সমান সমান হওয়া মোস্তাহাব। যদি সামান্য বেশী হয় তাতে ক্ষতি নেই।

১৪. কেউ যদি মসজিদে গিয়ে দেখে যে, এশার নামাজের শেষে তারাবীহর জামাত শুরু হয়ে গিয়েছে তবে তাকে একা একা একপাশে দাঁড়িয়ে এশার নামাজ পড়ে নিয়ে জামাতে शामिल হতে হবে। তারাবীহ শেষে বিতিরও জামাতের সাথেই পড়বে। তারপর যে কয় রাকাত তারাবীহ বাদ পড়েছে, তা একা একা আদায় করে নিবে।

১৫. যদি নিজের মহল্লার মসজিদের ইমাম কেরআত ভুল পড়ে, তবে অন্য স্থানের তারাবীহর নামাজের জামাতে যাওয়ায় দোষ হবে না।

১৬. রমজান মাসে একা একা বিতির পড়া অপেক্ষা জামাতের সঙ্গে বিতির পড়া উত্তম। জামাতে বিতির নামাজের তিন রাকাতেই ইমাম সশব্দে কেরআত পড়বেন। দোয়া কুনুত ইমাম, মোক্তাদী সবাইকে চুপে চুপে পড়তে হবে।

১৭. যদি তারাবীহ নামাজ বাদ পড়ে যায়, তবে কাজা আদায় করতে হবে না। কাজা পড়লে মাকরুহ হবে।

১৮. ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে তারাবীহ পড়া মাকরুহ।

১৯. তারাবীহ শেষ করে নীচের দোয়া পড়া যায়। এছাড়া অন্য যে কোনো দোয়াও পড়া যায়। তারাবীহ নামাজ শেষের মোনাজাতঃ-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا
خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ
يَا كَرِيمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُ -
اللَّهُمَّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাস আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজ্জুবিকা
মিনান্নার ইয়া খালিকাল জান্নাতি ওয়ান্নার বিরহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফ্ফারু
ইয়া করিমু ইয়া ছাত্তারু ইয়া রাহীমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বাররু,

আল্লাহুমা আজ্জিরনা মিনাল্লারি ইয়া মুজির ইয়া মুজির ইয়া মুজির বিরহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে বেহেশত প্রার্থনা করি এবং দোজখ থেকে মুক্তি চাই। হে বেহেশত এবং দোজখের সৃষ্টিকর্তা, হে গোনাহ ক্ষমাকারী, হে পরম দাতা, হে অপরাধ আচ্ছাদনকারী, হে পরাক্রমের অধিকারী, হে দয়াময়, আপন মেহেরবানীতে আমাদের প্রতি সদয় হও। হে আমাদের আল্লাহ, হে উদ্ধার কর্তা, হে মুক্তিদাতা, হে নিরাপত্তাদানকারী, হে শ্রেষ্ঠ করুণাময়, তোমার একান্ত করুণায় আমাদেরকে দোজখ থেকে রক্ষা করো।

কাজা নামাজ

ওয়াক্ত মতো নামাজ না পড়লে পরে নামাজ কাজা পড়তে হয়। নামাজ কাজা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে। অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। আবার শয়তান ও নফসের কুমন্ত্রণায়ও নামাজ কাজা হতে পারে।

যদি কারো অন্তরে এরকম বিশ্বাস থাকে যে, অবশ্যই নামাজ আল্লাহুপাকের হুকুম তারপরও যে নামাজ পড়ে না— সে মহা গোনাহ্গার। আর যে ব্যক্তি নামাজ আল্লাহুতায়ালার হুকুম এ কথা অন্তরে ও মুখে স্বীকার না করে সে ব্যক্তি প্রকৃতই কাফের।

নামাজ কাজা হলে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নামাজের কাজা আদায় করে নেয়া উচিত।

এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত নিয়মগুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন।

১. যদি কোনো এক ওয়াক্তের নামাজ কাজা হয়, তবে পরবর্তী ওয়াক্তের নামাজের আগেই কাজা পড়ে নিতে হবে। যেমন— যদি কারো এশার নামাজ অথবা বিতির নামাজ কাজা হয়, তবে ফজরের নামাজের আগেই কাজা আদায় করে নিতে হবে। এশা বা বিতিরের নামাজ কাজা না পড়ে ফজর পড়লে ফরজ নামাজ হবে না।

এরকম অবস্থায় এশা ও বিতিরের নামাজের কাজা আদায় করে নিয়ে পুনরায় ফজর নামাজ পড়তে হবে। এরকম যদি জোহর কাজা হয়, তবে আসর নামাজের আগে, আসর কাজা হলে মাগরিবের নামাজের আগে এবং মাগরিব কাজা হলে এশার নামাজের আগে পড়ে নিতে হবে।

২. কাজা না পড়েও ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়লে নামাজ হয়ে যায়— এরকম অবস্থা ৩টি— যেমন (১) কাজা নামাজ আদায় করতে গিয়ে যদি ওয়াক্তিয়া নামাজও কাজা হবার সম্ভাবনা থাকে (২) কাজা নামাজের কথা মনে না থাকলে (৩) পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামাজ কাজা হয়ে গেলে।

৩. ফজরের নামাজ পড়বার সময় কোনো ব্যক্তি যদি দেখে তার এশার নামাজ ও বিতির কাজা আছে। অথচ এশা ও বিতির কাজা পড়ে নিয়ে ফজর পড়তে গেলে ফজর নামাজের সময় চলে যায়, তখন সে ফজরের নামাজ পড়ে নিলে নামাজ হয়ে যাবে।

৪. জোহরের নামাজ পড়তে পড়তে অথবা নামাজ পড়া শেষে যদি কারো হঠাৎ মনে পড়ে তার ফজরের নামাজ কাজা ছিলো। এমতাবস্থায় তার জোহরের নামাজ হয়ে যাবে। পরে শুধু ফজরের কাজা পড়তে হবে।

৫. যদি কারো পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামাজ কাজা হয়ে যায় তখন কাজা নামাজ আদায় না করেও যদি কেউ ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়তে থাকে, তবে তার নামাজ হয়ে যাবে। তবে কাজা নামাজ এভাবে ফেলে না রেখে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, আদায় করে নিতে হবে।

৬. কাজা হওয়া নামাজের শুধু ফরজ এবং বিতিরের কাজা পড়তে হয়। সুন্নত নামাজের কাজা পড়তে হয় না। শুধু ফজরের নামাজের কাজা দুপুরের আগে পড়লে সুন্নতেরও কাজা আদায় করে নেয়া উচিত। যদি জোহরের ওয়াক্ত এসে যায়, তবে শুধু ফরজের কাজা পড়ে নিবে।

৭. যদি কেউ জুমআর নামাজ না পায়, তবে তাকে জোহর পড়ে নিতে হবে। যদি ঈদের নামাজ না পায়, তবে কাজা পড়তে হবে না।

৮. জোহরের ফরজের জামাতে শামিল হওয়ার জন্য যদি কেউ চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়ার সময় না পায়, তবে জামাত শেষে দুই রাকাত সুন্নতের পর বাদ পড়ে যাওয়া চার রাকাত সুন্নত পড়ে নিতে পারবে।

৯. যদি ফজরের জামাতে শামিল হতে গিয়ে কারো ফজরের দুই রাকাত সুন্নত বাদ পড়ে যায়, তবে বেলা ওঠার পরে বাদ পড়ে যাওয়া সুন্নত পড়ে নিতে পারবে।

১০. নফল নামাজ শুরু করার পর যদি কেউ নামাজ ছেড়ে দেয়, তবে এই নামাজের কাজা পড়তে হবে। কারণ নিয়ত করে নফল শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আর ওয়াজিব নামাজের কাজাতো আদায় করতেই হবে।

১১. দশ বিশ বৎসর বা আরো বেশী সময় ধরে কেউ বেনামাজী থাকার পর যদি খাঁটি অন্তঃকরণে তওবা করে, তবে পারলে তার পিছনের সকল কাজা নামাজ আদায় করে নেয়া উচিত। অন্ততপক্ষে এতটুকু করা উচিত যে, তওবার পরে যেনো কোনো অবস্থাতেই নামাজ কাজা না হয়। ভুলক্রমে যদি হঠাৎ কখনো নামাজ কাজা হয়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে কাজা আদায় করে নিবে। অতীতের নাফরমানীর জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত থাকবে এবং আল্লাহপাকের দয়া ও ক্ষমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। খাঁটি তওবার চিহ্ন এই যে, শুধু নামাজে নয়, সর্ব অবস্থায় তওবাকারীর

আমল শরীয়তের সাজে পুরোপুরি সজ্জিত থাকবে এবং আল্লাহপাকের দয়া ও ক্ষমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। প্রকৃতপক্ষে খাঁটি তওবা আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আল্লাহপাক খাঁটি তওবাকারীদের অতীতের সকল গোনাহ পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেন। নবী ও রসুলগণের জামানায় তাদের কাছে গিয়ে বায়াতের মাধ্যমে তওবা করার নিয়ম। যেহেতু আমাদের দয়াল নবী মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ স. এর মহাতিরোধানের পর আর কোনো নবী আসবেন না, তাই তাঁর খাঁটি কোনো নায়েব, কোনো কামেলে মোকাম্মেল পীর মোর্শেদের কাছে বায়াতের মাধ্যমে তওবা করা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহপাক যদি এরকম কোনো খাঁটি মোর্শেদের নিকট তওবা নসিব করেন, তবে আল্লাহপাকের কালাম অনুযায়ী তার অতীতের গোনাহসমূহও নেকি হয়ে যাবে। আল্লাহপাকের এরশাদ এরকম— ‘কিঞ্চ যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দিবেন।’ (সূরা আল ফুরকান)।

মোসাফিরের নামাজ

কোনো ব্যক্তি তার নিজ বাসস্থান থেকে তিন দিনের পথ অতিক্রম করার নিয়তে বাড়ী থেকে বের হলেই মোসাফির হিসাবে গণ্য হয়। তিন দিনের দূরত্বের পরিমাণ ৪৫ মাইল। অথবা ৪৮ মাইল। মোট কথা স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিন দিনে যতটুকু পথ অতিক্রম করা সম্ভব, ততটুকু দূরত্বে যাত্রা করার নিয়তে বের হলেই মোসাফির হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে যে সকল নিয়ম জেনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে—

১. মোসাফির জোহর, আসর এবং এশার ফরজ নামাজ চার রাকাতের বদলে দুই রাকাত পড়বেন। মাগরিব তিন রাকাতই পড়তে হবে। ফজরও দুই রাকাত পড়তে হবে।

২. মোসাফিরদের জন্য জোহর, আসর এবং এশার ফরজ নামাজ দুই রাকাত পড়া ওয়াজিব। এই রকম নামাজ পড়াকে কসর বলে।

মোসাফির ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কসর না পড়ে পূর্ণ নামাজ পড়ে, তবে গোনাহগার হবে।

৩. সুন্নত নামাজের ক্ষেত্রে কসর নেই। তবে সফর অবস্থায় সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ নফলে পরিণত হয়। মোসাফির সুন্নত না পড়লে কোনো দোষ নেই। তবে ফজরের আগের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়ে নেয়া উচিত। কারণ এই দুই রাকাত সুন্নত ওয়াজিবের মতো।

৪. এমন অবস্থায় পথমধ্যে প্রতি ওয়াক্তের শুধু ফরজ নামাজ পড়বে। সুন্নত না পড়াই ভালো। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলে যখন তাড়াহুড়া বা ব্যস্ততা না থাকে তখন ইচ্ছা করলে সুন্নত পড়া যায়।

৫. সফর অবস্থায় বিতির নামাজ পড়তেই হবে এবং যথানিয়মে তিন রাকাতই পড়তে হবে।

৬. মোসাফিরের জন্য আমি কসর পড়ছি এই রকম নিয়ত করার দরকার নেই। আমি জোহর পড়ছি, আসর পড়ছি, এশা পড়ছি এই রকম নিয়ত করতে হবে এবং এই রকম নিয়ত করেই কসর পড়তে হবে।

৭. মোসাফির নামাজের জামাতে ইমামতি করতে পারেন। কিন্তু জোহর, আসর এবং এশায় তাকে কসরই পড়তে হবে। মোক্তাদীদের মধ্যে যারা মোসাফির নন, তাঁরা ইমামের সালাম ফিরানোর পর বাকী দুই রাকাত নিজে নিজে আদায় করে নিবেন। এই দুই রাকাতে তারা সূরা ফাতিহা পড়তে পারবেন না। কেয়াম অবস্থায় সূরা ফাতেহা পড়তে যেটুকু সময় লাগে অতটুকু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁদেরকে বাকী দুই রাকাত নামাজ শেষ করে নিতে হবে। শেষের এই দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া মাকরুহ তাহরিমী।

৮. মোসাফির ইমামের পিছনে নামাজ পাঠকারী মোসাফির মোক্তাদীগণ ইমামের সঙ্গেই নামাজ শেষ করবেন।

৯. মোসাফির ইমাম নামাজের আগে নামাজীদেরকে জানিয়ে দিবেন, আমি মুসাফির। যদি আগে না জানান, তবে পিছন দিকে না ফিরে সালাম ফিরানোর পর বলে দিবেন, আমি মুসাফির।

১০. মুকিম অর্থাৎ স্থানীয় ইমামের পিছনেও মোসাফিরেরা জামাতে নামাজ পড়তে পারবেন। এরকম অবস্থায় ইমামের সঙ্গে তাদেরকে পুরো নামাজই পড়তে হবে। কারণ ইমামের অনুসরণ করা ফরজ।

১১. মুকিম অবস্থায় কাজা নামাজ মোসাফিরি অবস্থায় পড়লে পুরোপুরিই পড়তে হবে। আবার মোসাফিরি অবস্থার কাজা নামাজ মুকিম অবস্থায় পড়লে কসর অর্থাৎ অর্ধেক পড়তে হবে।

১২. বাড়ী থেকে সফরের নিয়তে কিছু দূর গিয়েই যদি নামাজের ওয়াক্ত হয়, তবে কসরই পড়তে হবে। আবার ফিরে এসে বাড়ীতে না পৌঁছানো পর্যন্ত কসরই পড়তে হবে, যদিও নামাজের স্থান থেকে নিজ বাড়ী বা গ্রাম বা শহর দেখা যায়।

১৩. যদি সফর অবস্থায় কোনো স্থানে ১৫ দিন বা ততোধিক সময় অবস্থানের নিয়ত করে তবে সেখানে পৌঁছলে সে আর মুসাফির বলে গণ্য হবে না। তাকে নামাজ পুরোপুরিই পড়তে হবে। কিন্তু পথিমধ্যে নামাজ পড়লে কসর পড়তে হবে।

১৪. ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত ছিলো, কিন্তু যদি কাজ শেষ হওয়ায় ১৫ দিনের আগেই চলে আসতে হয়, তবে তাকে কসর পড়তে হবে না। আবার ১৫ দিনের কম সময়ে সফর থেকে বাড়ী ফিরে আসবার নিয়ত থাকা সত্ত্বেও তাকে কসরই পড়তে হবে।

১৫. যদি কেউ সফর অবস্থায় তার নিজের শ্বশুরবাড়ী পৌছে যায়, তখন সে মুকিম হয়ে যাবে। তাকে নামাজ পুরোপুরি পড়তে হবে।

১৬. কারো নতুন নির্মিত বাড়ী যেখানে পরিবার পরিজন বাস করে, সেখানে পৌছে গেলেই সে মুকিম হয়ে যাবে।

অসুস্থ অবস্থার নামাজ

কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যদি দাঁড়াতে অসমর্থ হন, তিনি বসে নামাজ পড়বেন। বসে নামাজ পড়তে সক্ষম না হলে শুয়ে নামাজ পড়বেন।

এ সম্পর্কে জেনে নেয়া উচিত যে—

১. বসে নামাজ পড়ার সময় রুকু এমনভাবে করতে হবে, যেনো মাথা দুই হাঁটুর সীমানার বাইরে না যায়।

২. সেজদা যথানিয়মে করতে হবে।

৩. রুকু সেজদা করতে যদি অসুবিধা হয়, তবে ইশারায় রুকু সেজদা করবে। এ অবস্থায় সেজদার সময় রুকুর চেয়ে বেশী মাথা নোয়াতে হবে।

৪. শুয়ে নামাজ পড়ার সময় কেবলার দিকে পা লম্বা করে দিয়ে শোবে এবং মাথার ইশারায় রুকু সেজদা করবে। মাথার ইশারায় রুকু সেজদা করার শক্তি না থাকলে শক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। শুধু চোখের ইশারায় বা মনে মনে খেয়ালের ইশারায় নামাজ পড়লে নামাজ হবে না।

৫. এক দিন এক রাত পরিমাণ সময় বেহুঁশ বা পাগল হয়ে থাকলে হুঁশ ফিরে এলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কাজা পড়ে নিতে হবে। এর বেশী সময় বেহুঁশ বা পাগল থাকলে বাদ পড়ে যাওয়া নামাজের কাজা পড়তে হবে না।

তেলাওয়াতের সেজদা

কোরআন শরীফ পাঠকালে চৌদ্দটি স্থানে সেজদা করতে হয়। এই সব স্থানে সেজদা করা ওয়াজিব। সেজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে সেজদা করতে হয়। এই সকল সেজদাকে তেলাওয়াতের সেজদা বলে।

তেলাওয়াতের সেজদার বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত নিয়মগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমনঃ—

১. সেজদার আয়াত পড়া বা শোনা শেষে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে ‘আল্লাহু আকবর’ বলে একটি সেজদা করতে হবে। সেজদায় তিন বার ‘সোবহানা রব্বিইয়াল আ’লা’ পড়ে পুনরায় ‘আল্লাহু আকবর’ বলে উঠে দাঁড়াতে হবে।

২. পুরুষদের জন্য শব্দ করে ‘আল্লাহু আকবর’ বলা ভালো। মেয়েরা চুপে চুপে ‘আল্লাহু আকবর’ বলবে।

৩. বসা অবস্থায় যদি সেজদা করে উঠে পুনরায় বসে থাকে বা তেলাওয়াত অব্যাহত রাখে তাও জায়েয।

৪. তেলাওয়াতের সেজদার সময় অজু থাকতে হবে। সেজদার স্থান, শরীর, পরিধেয় বস্ত্র পাক থাকতে হবে।

৫. কেবলামুখী হয়ে সেজদা করতে হবে।

৬. বে-অজু অবস্থায় সেজদার আয়াত শুনলে তৎক্ষণাৎ অজু করে নিয়ে সেজদা আদায় করতে হবে। গোসল ফরজ হয়েছে এ অবস্থায় সেজদার আয়াত শুনলে সঙ্গে সঙ্গে গোসল করে নিয়ে সেজদা আদায় করতে হবে।

৭. হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় সেজদার আয়াত শুনলে সেজদা করতে হবে না।

৮. সেজদার আয়াত পড়ে বা শুনে সেজদা আদায় না করলে মৃত্যু আসার আগেই সেজদা আদায় করে নিতে হবে। নতুবা ওয়াজিব আদায় না করার গোনাহ থেকেই যাবে।

৯. নামাজের মধ্যে সেজদার আয়াত পড়লে নামাজের মধ্যেই সেজদা করে নিতে হবে। নামাজের পরে বা অন্য কোনো নামাজের মধ্যে সেজদা করে নিলে সেজদা আদায় হবে না। এ জন্য চিরদিন গোনাহ্গার থেকে যাবে।

১০. নামাজের মধ্যে সেজদার আয়াত পড়লে তৎক্ষণাৎ সেজদা করে নিয়ে আয়াতের পরবর্তী কিছু অংশ পড়ে নিয়ে পুনরায় যথানিয়মে রুকু সেজদাসহ নামাজ শেষ করে নিতে হবে।

১১. এক জায়গায় বসে বারবার একই সেজদার আয়াত পড়লেও একবারই সেজদা করতে হয়। কিন্তু স্থান পরিবর্তন করে একই সেজদার আয়াত পড়লে যতবার স্থান পরিবর্তন করবে ততবার সেজদা করতে হবে।

১২. এক জায়গায় সেজদার আয়াত শেষে সেজদা করে নিয়ে ঐ স্থানে বসেই যদি অন্য কোন কাজ করে অথবা দুনিয়াবী কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে পড়ার পর পুনরায় একই সেজদার আয়াত পড়ে তবে পুনরায় সেজদা করতে হবে।

১৩. ঘরের কামরা, বারান্দা, আঙ্গিনা বা মসজিদের ভিতরে যদি একই সেজদার আয়াত বার বার পড়তে থাকে তবে মাত্র একবার সেজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু এক কামরা থেকে আর এক কামরায় অথবা বারান্দায় অথবা এক ঘর থেকে আর এক ঘরে চলে যায়, তবে স্থান পরিবর্তন ধরে নিতে হবে এবং প্রতিস্থানের এক বা একাধিক তেলাওয়াতের জন্য সেজদা ওয়াজিব হবে।

নফল নামাজ

এ পর্যন্ত ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজের নিয়ম কানুন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এখন নফল নামাজের বিষয়ে কিছু কথা জেনে নেয়া যাক। সবশেষে ফরজে কেফায়া জানাজার নামাজের বিষয়ে বর্ণনা করা হবে।

নফল নামাজও সুন্নত তরিকা অনুযায়ী পাঠ করা প্রয়োজন। নফল নামাজের মধ্যে হজরত রসুলেপাক স. এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিলো তাহাজ্জুদ নামাজ। মেরাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে তাহাজ্জুদ নামাজ তাঁর উপরে ফরজ ছিলো। পরে আল্লাহ্‌পাক তাহাজ্জুদ নামাজ নফল করে দেন। নফল অর্থ ইচ্ছাধীন। বান্দা ইচ্ছা করলে তা করতে পারে, নাও করতে পারে— তাকেই নফল বলে। নফল নামাজ পড়লে ছওয়াব আছে। কিন্তু না পড়লে গোনাহ নেই।

গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে হয়। তারপর পুনরায় নিদ্রাগ্ন হয়ে পুনরায় ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ সময়মতো পড়ে নিতে হয়। এরকমভাবে নিয়মিত নামাজ পাঠ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। পূর্ববর্তী জামানায় জীবন এতো জটিল ছিলো না। জীবিকার নানাবিধ প্রয়োজনে এ জামানার মানুষকে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়। তাহাজ্জুদের বদলে অতি সহজ নামাজের শিক্ষা হজরত নবীয়ে পাক স.ই দিয়ে গিয়েছেন। ঐ সহজ নামাজই এ জামানার লোকদের আমল করা উচিত।

এশার ফরজ, সুন্নত শেষে বিতির পড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বসে সংক্ষিপ্ত কেরাআতের সঙ্গে যদি দুই রাকাত নামাজ কেউ পড়ে নেয়, তবুও সে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত লাভ করবে।

এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে—

হজরত ছাওবান রা. রসুলেপাক স. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি স. বলেছেনঃ এই রাত্রিজাগরণ কষ্টসাধ্য ও ভারী ব্যাপার। অতএব, তোমাদের কেহ যখন বিতির পড়বে তখন দুই রাকাত (নফল) পড়ে নিবে। তারপর যদি রাতে উঠতে পারে তো ভালই। না পারলে এই দুই রাকাতই তার জন্য যথেষ্ট। —মেশকাত শরীফ।

আর একটি নফল নামাজ হজরত রসুলে পাক স. অধিকাংশ সময় পড়তেন। ঐ নামাজের নাম এশরাক। এশরাক পড়ার সময় সূর্যোদয় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য স্থির হওয়ার সময় পর্যন্ত। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মোহাদ্দেছ হজরত মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী র. যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমন—

“আরবীতে বেলা বাড়াকে ‘জোহা’ বলে, কিন্তু জোহা এখানে সূর্যোদয়ের পর হইতে সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বুঝাইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে রসুলেপাক স. কিছু নফল নামাজ পড়িয়াছেন এবং উম্মতকেও পড়িতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা কন্মের মধ্যে দুই রাকাত। কিন্তু চার রাকাত পড়া উত্তম, আর বেশীর মধ্যে বারো রাকাত। ইহার নাম ‘ছালাতুজ্জোহা’ বা ছালাতুল আউয়াবিন। কিন্তু সাধারণতঃ সকালের দিকে পড়া হইলে উহাকে এশরাকের নামাজ এবং শেষের দিকে (১০/১১ টায়) পড়া হইলে উহাকে চাশতের নামাজ বলা হইয়া থাকে। মাগরিবের পরের ছয় রাকাতের নাম ছালাতুল আউয়াবিন বলিয়া কোনো হাদিছে উল্লেখ নাই।” –মেশকাত শরীফ, তৃতীয় খণ্ড।

তাহাজ্জুদ এবং এশরাক ছাড়াও আরো কিছু নফল নামাজ আছে। সেগুলোর মোটামুটি বিবরণ নীচে দেয়া হলো :

তাহাজ্জুদ নামাজ

রাতে দুই ঘুমের মধ্যবর্তী সময়ে তাহাজ্জুদ নামাজের সময়। তাহাজ্জুদ নামাজের রাকাতের কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। কমপক্ষে দুই রাকাত এবং বেশীপক্ষে দশ বারো রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। এই নামাজের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সূরা নেই। কোরআন শরীফের যে কোনো অংশের তেলাওয়াত করা যায়। তেলাওয়াত শব্দ করে অথবা চুপে চুপে দুইভাবেই পড়া যায়।

এশরাক বা চাশত বা আউয়াবিন

এশরাক নামাজ দুই রাকাত। চার রাকাত পড়া উত্তম। বারো রাকাতও পড়া যেতে পারে। এই নামাজের জন্যও কোনো সূরা নির্দিষ্ট নেই। জানা উচিত জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করা এশরাক নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম।

তাহিয়াতুল অজু

অজু বা গোসল করার পর পর শরীর বা অজুর অঙ্গের পানি শুকিয়ে যাবার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়াকে তাহিয়াতুল অজুর নামাজ বলে।

তাহিয়াতুল মসজিদ

মসজিদে প্রবেশ করেই দুই রাকাত নামাজ পড়াকে তাহিয়াতুল মসজিদের নামাজ বলে। তবে জামাত গুরু হতে বেশী দেরী না থাকলে তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

মুসিবতের নামাজ

ভয়াবহ বাদু, তুফান বা ভূমিকম্প অথবা বজ্রপাত, বরফপাত, অতিবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী, শত্রুর ভয় কিংবা যে কোনো ভয় বা বিপদের সৃষ্টি হলে আল্লাহপাকের নিকট সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে কিছু নফল নামাজ পড়াকে মুছিবতের নামাজ বলে।

ইসতেসকার নামাজ

অনাবৃষ্টি অথবা প্রচণ্ড খরার সময় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়াকে ইসতেসকার নামাজ বলে। ইসতেসকার নামাজ একা একা দুই রাকাত পড়া ভালো। পরে এলাকার সকল মুসলমান ময়দানে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে আল্লাহতায়ালায় নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে হয়।

খুসুফের নামাজ

চন্দ্রগ্রহণের সময়ও দুই রাকাত নামাজ পড়ার নিয়ম আছে। এই নামাজ একা একা পড়তে হয়। এই নামাজকে খুসুফের নামাজ বলে।

উপরে বর্ণিত নফল নামাজ ছাড়াও আরো কিছু নফল নামাজের বিধান আছে। যেমন সালাতুত তসবীহ, সালাতুল হাজাত, ইস্তেখারার নামাজ ইত্যাদি।

নফল নামাজের সময়

তাহাজ্জুদ এবং এশরাক নামাজ ছাড়া অন্য কোনো প্রকার নফল নামাজের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে সূর্যোদয় অবস্থায়, ঠিক দ্বিপ্রহরে এবং সূর্যাস্তের সময় অন্য সকল নামাজের মতো নফল নামাজ পড়াও নিষেধ। এ ছাড়াও আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিবের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া যাবে না। আবার সোবহে সাদেক থেকে সূর্য পূর্ণ উদয় না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রকার নফল নামাজ পড়া যাবে না।

নফল নামাজ সম্পর্কে শেষ কথা

নফল নামাজ কী

এ সম্পর্কে অনেকের ধারণা স্বচ্ছ নয়। নফল নামাজ না পড়াকে কেউ কেউ দোষের কাজ মনে করে থাকেন। শরীয়তের বিধান এই যে, নফল পড়া ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কেউ ইচ্ছা করলে নফল পড়তেও পারেন নাও পড়তে পারেন। পড়লে ছওয়াব হবে, না পড়লে কোনো গোনাহই হবে না। বরং অনেক নফল নামাজ পাঠকারী এমনও আছেন যারা অনেক ফরজ আদায় করেন না। এমন কি অনেকে

হারাম কাজে দিনের পর দিন লিপ্ত থেকেও নফল পড়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে থাকেন। ফরজ তরক করে এবং হারাম কাজে লিপ্ত থেকে নফল নামাজ পড়া অর্থহীন বরং গোনাহের কারণ। শয়তান তাদেরকে শরীয়তের মূল জ্ঞান ও আমল থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। ফরজ কাজ যেমন- হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা, হালাল উপায়ে কেনা কাপড় পরিধান করা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকিরে নিজের কলবকে (অন্তরকে) জিন্দা রাখা। খাছ মোজাদ্দিয়া তরিকার একনিষ্ঠ মুরিদগণ অতি সহজে সর্বাবস্থায় জিকিরময় কলব হাছেল করতে সক্ষম হন।

হারাম কাজ থেকে বিরত থাকাও ফরজ। যেমন গীবত করা, হিংসা করা, লোভ করা, অহঙ্কারভাবাপন্ন হওয়া ইত্যাদি। এই সকল দোষ থেকে মুক্ত না হয়েই যারা নফল নামাজে বা নফল অন্য কোনো প্রকার এবাদতে লিপ্ত হয়, তারা মুর্থ। এই সকল দোষ দূর করতে হলে খাঁটি নায়েবে নবী কামেলে মোকাম্মেল পীর মোর্শেদের রূহানী তাওয়াজ্জেহ লাভ করতে হয়। কামেল পীর মোর্শেদের নিকট বায়াত হয়ে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা অত্যন্ত জরুরী কাজ।

নফল নামাজ সম্পর্কে আর একটি কথা বলতেই হয়। জোহর, মাগরিব এবং এশার ফরজ নামাজের পরে দুই রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা পড়বার পর কেউ কেউ নিয়মিত দুই রাকাত করে নফল নামাজ পড়ে থাকেন। এই রকম ওয়াক্তে ওয়াক্তে নফল নামাজ নির্দিষ্ট করে নেয়া বেদাত কাজ। এই আমল বাদ দেয়া উচিত। পড়লেও কখনো কখনো পড়া উচিত। যাতে ফরজ, ওয়াজিব এবং সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজের মতো এই নামাজগুলোকেও মানুষ জরুরী মনে না করে। এ জামানার অনেক লোক এগুলোর নাম দিয়েছে ওয়াক্জিয়া নফল। এরকম নামকরণও বেদাত। অনেক নামাজী তথাকথিত ওয়াক্জিয়া নফলকে ওয়াজিব মনে করে নিয়েছে। তাই এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা উচিত। ওলামা এবং মাশায়েখগণ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন।

শেষ অধ্যায়

জানাজা

মৃত্যুর সময় করণীয় কাজঃ

যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হবে, তখন তাকে এমনভাবে উত্তর শিয়রে শোয়াতে হবে যেনো কেবলা তার ডানদিকে হয়। তার মাথা ডান দিকে কাত করে কেবলামুখী করানোর চেষ্টা করলে ভালো হয়।

এ সম্পর্কে যে সব নিয়ম জেনে নেয়া প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছেঃ

১. মৃত্যুযজ্ঞগার সময় রোগীর পাশে বসে সূরা ইয়াসিন পড়লে মৃত্যুকষ্ট কম হয়।

২. এই সময় মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কাছে বসে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এমন কোনো কথা বলা উচিত নয়।

৩. মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কলেমা শরীফ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ) পড়বার জন্য জোর-জবরদস্তি করা উচিত নয়। বরং নিজেরা শব্দ করে কলেমা শরীফ পড়বে এবং অপেক্ষা করতে থাকবে যেনো মুমূর্ষু ব্যক্তি আপনা আপনি কলেমা উচ্চারণ করে। একবার কলেমা উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট মনে করবে। বার বার উচ্চারণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করবে না।

৪. আল্লাহ না করুক মৃত্যুর সময় যদি কারো মুখ দিয়ে কোনো কুফরী কথা উচ্চারিত হয়, তবে এই কথা প্রচার না করে গোপন রাখা উচিত। মনে করবে কঠিন রোগযজ্ঞগার কারণেই তার মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে এরকম কথা বের হয়েছে। আর বেহুঁশ অবস্থার অপরাধ তো আল্লাহপাক ক্ষমা করে দিয়েই থাকেন।

৫. রুহ্ বের হবার পর পরই উপস্থিত সবাই নিম্নের দোয়া পড়বেঃ

“ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি ওয়াখলুফলি খইরম্ মিন্না।

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন। হে আল্লাহ! বিপদের সময়ের প্রতিদান এবং বিপদের বিনিময় স্বরূপ আমাদেরকে কল্যাণ দান করো।

মৃত্যুর পর করণীয় কাজঃ

মৃত্যুর পর নিম্নবর্ণিত কাজগুলো করতে হবে—

১. রুহ্ বের হবার পর একটি কাপড় দ্বারা মৃতদেহের খুতনির নীচ থেকে মাথাসহ পেচিয়ে বেঁধে দিবে যাতে মুখ বন্ধ হয়ে থাকে।

২. বিস্মিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রসূলিল্লাহ্ বলতে বলতে সযত্নে মৃতদেহের চোখ বন্ধ করে দিবে এবং হাত পাগুলো সোজা করে দিবে।

৩. মৃতদেহের পেটের উপর কোনো ভারী বস্তু রেখে দিবে যাতে পেট ফুলে না উঠতে পারে।

৪. নাপাক অবস্থায় কোনো পুরুষ অথবা মহিলাকে মৃতদেহের কাছে আসতে নিষেধ করে দিবে।

৫. হায়েজ নেফাস অবস্থায় মহিলাদেরকে মৃতদেহের কাছে আসতে দিবে না।

৬. সঙ্গতি থাকলে আগরবাতি জ্বালিয়ে মৃতদেহের পাশে রেখে দিবে।

৭. গোসল করানোর আগে মৃতদেহের পাশে বসে কোরআন শরীফ পড়া জায়েয নয়।

৮. কাফন দাফন যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করবে।

৯. শুক্রবার দিন কারো ইন্তেকাল হলে জুমআর নামাজের আগেই জানাজার নামাজের ব্যবস্থা করবে। বেশী লোক সমাগম হবে এই আশায় জুমআর নামাজ পর্যন্ত জানাজার নামাজ বিলম্ব করা মকরুহ্।

১০. মৃতের জন্য চিৎকার করে মাতম বিলাপ ইত্যাদি করা জায়েয নয়। নিঃশব্দে ক্রন্দন জায়েজ। বরং সুন্নত।

মৃতদেহের গোসল করানোর নিয়মঃ

গোসল করানোর আগে মৃতের পরিধেয় খুলে ফেলে শুধু নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবে। লাশ উত্তর দিকে মাথা রেখে শোয়াবে এবং গোসলের জায়গা পর্দা করে নিবে। তারপর গোসলদাতা হাতে কিছু ন্যাকড়া জড়িয়ে কাপড়ের নীচে হাত প্রবেশ করিয়ে প্রথমে ডিলা দ্বারা পরে পানি দ্বারা মৃতের এস্তেঞ্জা করিয়ে দিবে। তারপর অজুর স্থানগুলো ধুইয়ে দিবে। কুল্লি করানো, নাকে পানি দেওয়া, হাতের কজি পর্যন্ত ধোয়ানো— এসব করার প্রয়োজন নেই। প্রথমে মুখ, তারপর ডান হাত, তারপর বাম হাত কনুইসহ ধুইয়ে দিবে। কিছু তুলা বা ন্যাকড়া হাতের আঙ্গুলে জড়িয়ে তিনবার দাঁতের উপর এবং নাকের ভিতর মুছে দেয়া যেতে পারে। যদি গোসলের প্রয়োজন ছিলো এ অবস্থায় অথবা হায়েজ নেফাস অবস্থায় মৃত্যু হয়ে থাকে তবে মুখের ভিতরে এবং নাকের ভিতরে ভেজা তুলা বা কাপড় দিয়ে মুছে দেয়া জরুরী। এরপর মৃতের নাকে এবং মুখে কিছু তুলা গুঁজে দিবে যাতে গোসলের সময় নাকে ও মুখে পানি ঢুকতে না পারে।

এরপর মৃতদেহকে ডান দিকে কাত করে শোয়াবে এবং বাম পাশের উপরে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি ঢেলে দিবে। তিনবার অথবা পাঁচবার এভাবে পানি ঢেলে দেওয়ার পর মৃতদেহকে বাম দিকে কাত করে শোয়াবে এবং তিনবার অথবা পাঁচবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি ঢেলে দিবে। এরপর গোসলদানকারী নিজের শরীরের বা অন্য কোনোকিছুর সঙ্গে মৃতদেহকে ঠেস দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় রেখে আস্তে আস্তে মৃতের পেটের উপরে মালিশ করবে। এরকম করার পর যদি পেট থেকে কিছু ময়লা বের হয় তবে সেগুলো কুলুখের সাহায্যে মুছে পরিষ্কার করে দিতে হবে। মৃতকে পুনরায় অঙ্গু গোসল করাতে হবে না। এভাবে মৃতের গোসল শেষ করতে হবে।

এ সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যে—

১. গোসলের পানি বরই পাতাসহ সিদ্ধ করে নেয়ার নিয়ম। বরই পাতা না পেলে শুধু পানি গরম করে নেয়া যাবে। গোসলের সময় পানি সামান্য গরম থাকলেই চলবে।

২. গোসলের পর সকল শরীর শুকনা কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মুছে দিতে হবে, যাতে কাফনের কাপড় পরালে তা ভিজে না যায়।

৩. গোসলের পর যত্ন সহকারে কাফন পরাতে হবে।

৪. কাফন পরাবার সময় স্ত্রীলোকদের মাথায় এবং পুরুষদের মাথায় এবং দাড়িতে আতর লাগিয়ে দিবে।

৫. সেজদার সকল অঙ্গে অর্থাৎ কপালে, নাকে, দুই হাতের তালুতে, দুই পায়ের হাঁটুতে এবং পায়ে কর্পুর লাগিয়ে দিবে।

৬. স্ত্রী স্বামীর কাফন পরাতে পারবে। মৃত স্বামীর চেহারা দেখতে পারবে। তাকে গোসলও করাতে পারবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহকে স্পর্শ করতে পারবে না। গোসলও করাতে পারবে না। তবে স্ত্রীর চেহারা দেখতে পারবে। কাপড়ের উপর দিয়ে স্ত্রীর মৃতদেহ স্পর্শ করতে পারবে। স্ত্রীর লাশও বহন করতে পারবে।

৭. মৃতকে গোসল করানোর আগে গোসলদাতার নিজের অঙ্গু করে নেয়া ভালো।

৮. মৃতের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেখা জায়েয নয়। খালি হাতে স্পর্শ করাও জায়েয নয়।

৯. মৃতদেহকে গোসল করানো, কাফন পরানো, জানাজা দেয়া এবং দাফন করা ফরজে কেফায়া।

১০. পুরুষ মহিলা সবার জন্য সাদা কাফন উত্তম।

১১. বেশী দামের কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া উচিত নয়। কারণ কাফনের কাপড় অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়।

জানাজা বহন করার নিয়মঃ

জানাজা বহনের সময় নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলতে হয়।

১. দুধপোষ্য শিশু বা তার চেয়ে কিছু বড় শিশুর মৃতদেহ দুই হাতে নিয়ে কবরস্থানের দিকে যেতে হবে। এ রকম লাশ একাই বহন করা যায়। কিছুক্ষণ পথ চলার পর আর একজন বহন করবে। এভাবে পালাক্রমে কয়েকজন লাশ বহন করতে পারবে।

২. প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের লাশ খাটে করে বহন করতে হয়। খাটের চারকোণায় চারজন খাট বহন করবে।

৩. খাট বহনের সময় লাশের মাথার দিক সামনে রাখতে হবে।

৪. জানাজা নিয়ে দ্রুত হাঁটা সুনুত। তবে এমন জোরে হাঁটা উচিত নয় যাতে খাটের উপরের লাশ দোল খেতে থাকে।

৫. জানাজার সঙ্গে গমনকারীগণ জানাজার পিছনে যাবে। এরকম করা মোস্তাহাব তবে জানাজার সামনে হাঁটাও জায়েজ। তবে জানাজার ডানে বামে হাঁটা উচিত নয়।

জানাজার নামাজের সময়ঃ

জানাজার নামাজের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। যে কোনো সময় জানাজার নামাজ পড়া যায়। সূর্যোদয়ের সময়, ঠিক দ্বিপ্রহরে এবং সূর্যাস্তের সময় ওয়াক্জিয়া নামাজ পড়া নিষেধ। কিন্তু জানাজার নামাজ পড়া নিষেধ নয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে জানাজা যদি নামাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগে এসে থাকে তবে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর জানাজার নামাজ পড়তে হবে। এরকম অবস্থায় নামাজের নিষিদ্ধ সময়ে জানাজা নামাজ পড়া জায়েজ হবে না। কিন্তু নিষিদ্ধ সময়ের ভিতর যদি জানাজা আসে তবে তখন জানাজার নামাজ পড়া সম্পূর্ণই জায়েয হবে।

জানাজার নামাজের নিয়মঃ

জানাজার নামাজের সামনে মৃতের কাফন ঢাকা লাশ রাখতে হয়। ইমাম লাশের সিনা বরাবর দাঁড়াবেন। পিছনে সারিবদ্ধভাবে মোক্তাদীরা দাঁড়াবেন।

ইমাম মোক্তাদী উভয়েই ‘আমি এই মৃতের দোয়ার জন্য জানাজার নামাজ পড়ছি’ এই রকম নিয়ত করবেন। তারপর ইমাম আল্লাহ্ আকবর জোরে উচ্চারণ করে কানের লতি বরাবর দুই হাত তুলে নাভি বরাবর বাম হাত রেখে ডান হাতের বৃদ্ধা এবং কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কজি বেঁধে বাকী তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপরে বিছিয়ে ছানা পড়বেন। যেমন অন্যান্য নামাজের শুরুতে ছানা

পড়তে হয়। তারপর পুনরায় আল্লাহ্ আকবর জোরে উচ্চারণ করে চুপে চুপে দরুদ শরীফ পড়বেন। দরুদ শরীফ পড়া শেষে পুনরায় আল্লাহ্ আকবর জোরে বলে চুপে চুপে দোয়া পড়বেন।

জানাজার নামাজের দোয়াঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَانْثَانَا - اَللّٰهُمَّ مَنْ
اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَي الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا
فَتَوَقَّهُ عَلَي الْاِيْمَانِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়্বিনা, ওয়া ছগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া জাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাছ মিন্না ফা আহ্ইহি আ'লাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাছ মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহ্ আ'লাল ঈমান, বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন।

অর্থঃ হে আমাদের আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্যে জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা সকলের গোনাহ্সমূহ দয়া করে মাফ করে দাও। হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখতে চাও তাকে দ্বীন ইসলামের উপরে জীবিত রেখে। আর যাকে মৃত্যু দান করতে চাও তাকে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু দান করো।

এই দোয়া পড়ার পর পুনরায় জোরে তকবীর বলে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্ বলে সালাম ফিরাতে হবে। এই নিয়মেই জানাজার নামাজ পড়তে হয়।

এ সম্পর্কে আরো কিছু জরুরী নিয়ম কানুন জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমন—

১. জানাজার নামাজ চার তকবীরের সঙ্গে পড়তে হয়। প্রথম তকবীরের সময় কানের লতি বরাবর দুই হাত কেবলামুখী করে উঠাবার পর নাভি বরাবর হাত বেঁধে দাঁড়াতে হয়। পরের তিন তকবীরের সময় হাত উঠাতে হবে না। হাত বাঁধা অবস্থায় রেখেই প্রথম তকবীর বলে ছানা, দ্বিতীয় তকবীর বলে দরুদ শরীফ, তৃতীয় তকবীর বলে দোয়া এবং চতুর্থ তকবীর বলে সালাম ফিরাতে হয়।

২. ইমাম তকবীর এবং সালাম জোরে বলবেন। মোক্তাদিরা চুপে চুপে বলবেন। ছানা, দরুদ শরীফ, দোয়া, সালাম ইমাম মোক্তাদী সবাইকে চুপে চুপে পড়তে হবে।

৩. জানাজার নামাজ ছুটে যাবার আশংকা থাকলে পানি নিকটে থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে জানাজার নামাজে শরীক হওয়া যায়।

৪. জুতা পায়ে রেখেও জানাজার নামাজ পড়া যায়। কিন্তু জুতার তলা এবং জুতার তলার জমিন পাক থাকতে হবে। আর যদি জুতা খুলে জুতার উপরে পা রেখে দাঁড়ায় তবে পায়ের সঙ্গে সংযুক্ত জুতার উপরের অংশ পাক থাকলেই চলবে। জুতার তলা এবং জুতার তলার জমিন নাপাক থাকলেও জানাজার নামাজ হয়ে যাবে।

৫. জানাজার নামাজের জন্য জামাত শর্ত নয়। একজনে পড়লেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

৬. জানাজার নামাজ তিন কাতার করা মোস্তাহাব। ইমাম ছাড়া পাঁচজন উপস্থিত থাকলে, ইমামের পিছনে প্রথম কাতারে দুইজন, দ্বিতীয় কাতারে দুইজন এবং তৃতীয় কাতারে একজন এই নিয়মে দাঁড়াতে হবে। লোক সমাগম বেশী হলে ৫ কাতার অথবা ৭ কাতার অথবা যে কোনো বেজোড় সংখ্যক কাতার করা ভালো।

৭. গায়েবী জানাজা পড়া জায়েজ নেই। জানাজার নামাজে লাশ উপস্থিত থাকতে হবে।

৮. ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র যে শিশুর মৃত্যু হয়েছে তারও নাম রাখবে এবং গোসলও দিবে। নিয়ম মোতাবেক কাফন এবং জানাজার নামাজ পড়তে হবে না। শুধু এক খণ্ড কাপড় দিয়ে লাশ ঢেকে দিয়ে কবরে মাটি চাপা দিয়ে রাখলেই চলবে।

৯. আর যে শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে তারও নাম রাখবে এবং গোসলও দিবে। নিয়ম মোতাবেক কাফন এবং জানাজার নামাজ পড়তে হবে না। শুধু একখণ্ড কাপড় দিয়ে লাশ ঢেকে দিয়ে কবরে মাটি চাপা দিয়ে রাখলেই চলবে।

দাফনের নিয়মঃ

মৃতদেহ দাফনের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত নিয়মগুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন।

১. লাশ কবরে নামানোর জন্য তিনজন অথবা চারজন কবরে নামতে পারে। তারা কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন এবং খাট থেকে লাশ নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে উত্তর দিকে মাথা এবং দক্ষিণ দিকে পা করে লাশকে কবরে শোয়াবেন। লাশের মুখ কেবলামুখী করে দিতে হবে।

২. মহিলাদের লাশ তাদের সঙ্গে যাদের বিবাহ হারাম ছিলো এই রকম পুরুষেরা কবরে নামাবেন। যদি এরকম কেউ না থাকেন তবে দ্বীনদার, পরহেজগার লোকেরা নামাবেন।

৩. লাশ কবরে রাখবার সময় বলতে হবেঃ

বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রসূলিল্লাহ্।

অর্থঃ আল্লাহর নামের উপর এবং রসুলের দ্বীনের উপর সমর্পণ করছি।

৪. কবরে রাখার পর কাফনের বাঁধনগুলো খুলে দিতে হবে। তারপর বাঁশ অথবা কাঁচা ইট কবরের উপর সমান করে বিছিয়ে দিয়ে কবর ঢেকে দিবে। কাঁচা পাতা ইত্যাদি বিছিয়ে মাটি দিবে। কবর মাছের পিঠের মতো করবে। চৌকোণা করবে না।

৫. মহিলাদের কবরে নামানোর সময় পর্দা করবে।

৬. কবর অর্ধহাত পর্যন্ত উঁচু করা যাবে। এর বেশী উঁচু করা মাকরুহ্। কিন্তু কবর খোঁড়া মাটি দিয়েই যদি আধ হাতের বেশী উঁচু হয়, তবে মাকরুহ্ হবে না।

৭. কবরের মাথার দিক থেকে মাটি দেয়া শুরু করবে। প্রথম মুষ্টি মাটি দেয়ার সময় বলবে—

মিনহা খলাকনাকুম (এই মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছে)

দ্বিতীয়বার মাটি দেওয়ার সময় বলবে—

ওয়া ফীহা নুঈদুকুম (আবার তোমাদেরকে মাটিতেই ফিরিয়ে দিবো)

তৃতীয়বার মাটি দেয়ার সময় বলবে—

ওয়া মিন্হা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা (এই মাটি থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে তুলবো)।

৮. মাটি দেয়া শেষে কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া মোস্তাহাব। পানি মাথার দিক থেকে দেয়া শুরু করবে। তারপর একটি তাজা গাছের ডাল কবরে পুঁতে দিলে ভালো হয়।

৯. দাফন শেষে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু দোয়া কালাম পড়ে মৃত ব্যক্তির কবরে ছওয়াব রেসানী করা মোস্তাহাব।

সর্বশেষ অধ্যায়

নামাজের সময়সূচী

সবশেষে নামাজের সময়সূচী সংযোজন করা হলো। সংক্ষেপ করার জন্য প্রতি পাঁচদিন পর পর সময়সূচী উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যবর্তী তারিখগুলোতে অর্ধ মিনিট যোগ অথবা বিয়োগ করে নিতে হবে।

সময়সূচী সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত কথাগুলোও জেনে রাখতে হবে। সময়সূচীতে মোট ছয়টি ঘর আছে। প্রতি ঘর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো নীচে এক এক করে লিখে দেয়া হলো।

১. প্রথম ঘর— প্রথম ঘরে সেহেরীর শেষ সময় উল্লেখ করা হয়েছে। সাবধানতার জন্য এই সময়টি সোবহে সাদেক শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে ধরা হয়েছে। সুতরাং ফজরের নামাজের আজান এই সময়ের পাঁচ মিনিট পরে দিতে হবে। কারণ ফজরের নামাজ সোবহে সাদেক থেকে শুরু হয়।

২. দ্বিতীয় ঘর— দ্বিতীয় ঘরে সূর্য উদয় হওয়ার সময় দেয়া হয়েছে। এই ঘরে লিখিত সময় থেকে ২৩ মিনিট পর্যন্ত নামাজ পড়া নিষেধ।

৩. তৃতীয় ঘর— তৃতীয় ঘরে দেয়া হয়েছে সূর্য ঢলে পড়ার সময়। এই সময়ের পূর্বে ২৫ মিনিট পর্যন্ত নামাজ পড়া নিষেধ। এই সময়ের ২৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত ফরজ এবং নফল রোজার নিয়ত করা যায়। এর পরে যায় না। এই ঘরের সময় থেকে জোহরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়।

৪. চতুর্থ ঘর— এই ঘরে উল্লিখিত সময় থেকে আসরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। এর আগে পর্যন্ত জোহরের নামাজের ওয়াক্ত।

৫. পঞ্চম ঘর— এই ঘরের সময় থেকে ইফতার শুরু ধরা হয়। সাবধানতার জন্য এই সময় সূর্যাস্তের পাঁচ মিনিট পরে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এই উল্লিখিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই সূর্য অস্ত যায়। আর সূর্যাস্তের সময় থেকেই মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়।

৬. ষষ্ঠ ঘর— ষষ্ঠ ঘরে উল্লিখিত সময় থেকে এশার নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়।

দূরত্বের কম বেশীর জন্য সময়ের তারতম্য

এই সময়সূচী ঢাকা শহরের জন্য তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য শহর ও অঞ্চলে দূরত্বের কমবেশীর কারণে সময়ের কিছু পরিবর্তন করতে হবে। ঢাকার পূর্ব দিকের শহরগুলোর জন্য প্রতি ২০ মাইলে ১ মিনিট কমাতে হবে এবং পশ্চিম দিকের শহরগুলোর জন্য ১ মিনিট বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের বড় বড় কয়েকটি শহরে সময়সূচী কতোখানি বাড়াতে কমাতে হবে তা নীচে উল্লেখ করা হলো।

শহরের নাম	যতটুকু কম বেশী করতে হবে।			
	সূর্যাস্ত	সূর্যোদয়	এশা	সেহেরী
১. যশোর	৪ মিনিট বাড়বে	৪ মিনিট বাড়বে	৪ মিনিট বাড়বে	৪ মিনিট বাড়বে
২. কুষ্টিয়া	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩. ফরিদপুর	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪. কুমিল্লা	৪ মিনিট কমবে	৪ মিনিট কমবে	৪ মিনিট কমবে	৪ মিনিট কমবে
৫. ফেনী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৬. চাঁদপুর	২ মিনিট কমবে	২ মিনিট কমবে	২ মিনিট কমবে	২ মিনিট কমবে
৭. ময়মনসিংহ	২ মিনিট বাড়বে	৩ মিনিট কমবে	২ মিনিট বাড়বে	৩ মিনিট কমবে
৮. কিশোরগঞ্জ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৯. বগুড়া	৫ মিনিট বাড়বে	২ মিনিট বাড়বে	৬ মিনিট বাড়বে	১ মিনিট বাড়বে
১০. পাবনা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১. রাজশাহী	৯ মিনিট বাড়বে	৭ মিনিট বাড়বে	১০ মিনিট বাড়বে	৪ মিনিট বাড়বে
১২. সিলেট	২ মিনিট কমবে	৯ মিনিট কমবে	১ মিনিট বাড়বে	৩ মিনিট কমবে
১৩. রংপুর	৭ মিনিট বাড়বে	১ মিনিট কমবে	১ মিনিট বাড়বে	৩ মিনিট কমবে
১৪. দিনাজপুর	১১ মিনিট বাড়বে	৩ মিনিট বাড়বে	১৩ মিনিট বাড়বে	৬ মিনিট বাড়বে
১৫. চট্টগ্রাম	৬ মিনিট কমবে	৩ মিনিট কমবে	৬ মিনিট কমবে	৩ মিনিট কমবে
১৬. নোয়াখালী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৭. খুলনা	২ মিনিট বাড়বে	৫ মিনিট বাড়বে	১ মিনিট বাড়বে	৬ মিনিট বাড়বে
১৮. বরিশাল	৩ মিনিট কমবে	৩ মিনিট বাড়বে	৪ মিনিট কমবে	১ মিনিট বাড়বে

শেষ বক্তব্য

বহুদিন ধরে অন্তরে একান্ত ইচ্ছা ছিলো যে, নামাজের নিয়ম কানুন সম্পর্কে একটি সহজ সরল এবং সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করি। আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্ পাক অবশেষে এই ইচ্ছা পূরণ করলেন। দোয়া করি এবং দৃঢ় আশাও রাখি পুস্তকখানি আল্লাহপাকের দরবারে মঞ্জুর হবে।

আল্লাহপাক এই বইয়ের লেখক, পাঠক, পাঠিকা, প্রকাশক- সবাইকে ক্ষমা করুন এবং সবারই নাম তাঁর প্রিয় বান্দা-বান্দীগণের দপ্তরভুক্ত করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

‘নামাজের নিয়ম’ রচনা করতে গিয়ে যে সকল কিতাব থেকে মাসআলা সংগ্রহ করতে হয়েছে এবং যে সকল কিতাবাদির সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে, সেগুলোর তালিকা নীচে উল্লেখ করা হলো-

১। ফাতোয়ায়ে আলমগীরি ২। বেহেশতী জেওর ৩। কুদুরী ৪। মেফতাহুল জান্নাত ৫। নামাজ ও মাসআলা শিক্ষা ৬। রাহে নাজাত ৭। যীনাতুল মুসল্লিন ৮। তরিকুল ইসলাম ৯। হাদিয়াতুল মুসাল্লীন ১০। আহকামে মাইয়েত ১১। আসসালাত ১২। বোখারী শরীফ ১৩। মুসলিম শরীফ ১৪। মেশকাত শরীফ ১৫। ওস্‌ওয়ামে রসূলে আকরাম স. ১৬। তফসীরে মা আরেফুল কোরআন ১৭। ভুল সংশোধন।

নামাজ, সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী

মাস ও তারিখ	সেহরীর শেষ সময়	সূর্যোদয় ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময়	আসরের সময়	মাগরিব ও ইফতারের সময়	এশার সময়
	ফজর আরম্ভ	ফজরের শেষ	জোহরের সময়	আসরের সময়	মাগরিব ও ইফতারের সময়	এশার সময়
	১	২	৩	৪	৫	৬
	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ
১লা জানুয়ারী	৫-১৪	৬-৪১	১২-০৩	৩-৪৯	৫-৩০	৬-৪৬
৫ই জানুয়ারী	৫-১৫	৬-৪২	১২-০৫	৩-৫২	৫-৩৩	৬-৪৯
১০ই জানুয়ারী	৫-১৬	৬-৪৩	১২-০৭	৩-৫২	৫-৩৬	৬-৫২
১৫ই জানুয়ারী	৫-১৭	৬-৪৫	১২-০৯	৩-৫৭	৫-৩৮	৬-৫৪
২০শে জানুয়ারী	৫-১৭	৬-৪৪	১২-১১	৪-০৩	৫-৪৩	৬-৫৮
২৫শে জানুয়ারী	৫-১৭	৬-৪৩	১২-১২	৪-০৬	৫-৪৬	৭-০১
১লা ফেব্রুয়ারী	৫-১৭	৬-৪১	১২-১৪	৪-১১	৫-৫২	৭-০৫
৫ই ফেব্রুয়ারী	৫-১৫	৬-৩৯	১২-১৪	৪-১৩	৫-৫৪	৭-০৭
১০ই ফেব্রুয়ারী	৫-১২	৬-৩৬	১২-১৪	৪-১৬	৫-৫৭	৭-১০
১৫ই ফেব্রুয়ারী	৫-১০	৬-৩৩	১২-১৪	৪-১৭	৬-০০	৭-১২
২০শে ফেব্রুয়ারী	৫-০৭	৬-৩০	১২-১৪	৪-২০	৬-০৩	৭-১৪
২৫শে ফেব্রুয়ারী	৫-০৪	৬-২৬	১২-১৩	৪-২৩	৬-০৫	৭-১৬

নামাজ, সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী

মাস ও তারিখ	সেহরীর শেষ সময় ফজর আরম্ভ	সূর্যোদয় ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইফতারের সময় আরম্ভ	এশার সময় আরম্ভ
	১ ঘঃ মিঃ	২ ঘঃ মিঃ	৩ ঘঃ মিঃ	৪ ঘঃ মিঃ	৫ ঘঃ মিঃ	৬ ঘঃ মিঃ
১লা মার্চ	৪-৫৮	৬-২০	১২-১১	৪-২৫	৬-০৭	৭-১৮
৫ই মার্চ	৪-৫৭	৬-১৯	১২-১২	৪-২৭	৬-১০	৭-২১
১০ই মার্চ	৪-৫৩	৬-১৫	১২-১১	৪-২৮	৬-১২	৭-২৩
১৫ই মার্চ	৪-৪৮	৬-০৯	১২-০৯	৪-২৮	৬-১৪	৭-২৪
২০শে মার্চ	৪-৪৩	৬-০৫	১২-০৮	৪-৩০	৬-১৬	৭-২৭
২৫শে মার্চ	৪-৩৮	৫-৫৬	১২-০৬	৪-৩০	৬-২০	৭-২৮
১লা এপ্রিল	৪-৩০	৫-৫৩	১২-০৫	৪-৩১	৬-২১	৭-৩২
৫ই এপ্রিল	৪-২৬	৫-৪৯	১২-০৩	৪-৩১	৬-২২	৭-৩৪
১০ই এপ্রিল	৪-২১	৫-৪৫	১২-০২	৪-৩১	৬-২৪	৭-৩৭
১৫ই এপ্রিল	৪-১৫	৫-৪০	১২-০০	৪-৩১	৬-২৫	৭-৩৯
২০শে এপ্রিল	৪-১১	৫-৩৬	১১-৫৯	৪-৩২	৬-২৭	৭-৪১
২৫শে এপ্রিল	৪-০৬	৫-২৯	১১-৫৭	৪-৩২	৬-২৯	৭-৪৪

নামাজ, সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী

মাস ও তারিখ	সেহরীর শেষ সময় ফজর আরম্ভ	সূর্যোদয় ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইফতারের সময় আরম্ভ	এশার সময় আরম্ভ
	১	২	৩	৪	৫	৬
	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ

১লা মে	৪-০১	৫-২৫	১১-৫৭	৪-৩২	৬-৩৬	৮-৪৮
৫ই মে	৩-৫৭	৫-২৫	১১-৫৭	৪-৩৩	৬-৩৬	৮-৫০
১০ই মে	৩-৫২	৫-২১	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩৬	৮-৪৮
১৫ই মে	৩-৫০	৫-১৯	১১-৫৬	৪-৩৩	৬-৩৬	৮-৪৮
২০শে মে	৩-৪৬	৫-১৭	১১-৫৬	৪-৩৪	৬-৩৬	৮-৪৮
২৫শে মে	৩-৪৪	৫-১৬	১১-৫৭	৪-৩৫	৬-৩৬	৮-৪৮
১লা জুন	৩-৪২	৫-১৫	১১-৫৭	৫-৩৪	৬-৩৬	৮-৪৮
৫ই জুন	৩-৪০	৫-১৩	১১-৫৭	৫-৩৭	৬-৩৬	৮-৪৮
১০ই জুন	৩-৪০	৫-১৩	১১-৫৭	৫-৩৮	৬-৩৬	৮-৪৮
১৫ই জুন	৩-৪১	৫-১৩	১২-০০	৫-৩৯	৬-৩৬	৮-৪৮
২০শে জুন	৩-৪১	৫-১১	১২-০১	৫-৩৮	৬-৩৬	৮-৪৮
২৫শে জুন	৩-৪১	৫-১০	১২-০২	৫-৩৮	৬-৩৬	৮-৪৮

নামাজ, সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী

মাস ও তারিখ	সেহরীর শেষ সময় ফজর আরম্ভ	সূর্যোদয় ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইফতারের সময় আরম্ভ	এশার সময় আরম্ভ
	১ ঘঃ মিঃ	২ ঘঃ মিঃ	৩ ঘঃ মিঃ	৪ ঘঃ মিঃ	৫ ঘঃ মিঃ	৬ ঘঃ মিঃ
১লা জুলাই	৩-৪৩	৫-১৭	১২-০৪	৪-৪১	৬-৫৫	৮-১৭
৫ই জুলাই	৩-৪৫	৫-১৯	১২-০৫	৪-৪৩	৬-৫৫	৮-১৭
১০ই জুলাই	৩-৪৭	৫-২১	১২-০৫	৪-৪৫	৬-৫৪	৮-১৬
১৫ই জুলাই	৩-৫১	৫-২৩	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫৪	৮-১৫
২০শে জুলাই	৩-৫৩	৫-২৫	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫২	৮-১৩
২৫শে জুলাই	৩-৫৬	৫-২৭	১২-০৬	৪-৪৪	৬-৫০	৮-১০
১লা আগস্ট	৪-০১	৫-৩০	১২-০৬	৪-৪৩	৬-৪৭	৮-০৫
৫ই আগস্ট	৪-০৩	৫-৩২	১২-০৬	৪-৪২	৬-৪৫	৮-০৩
১০ই আগস্ট	৪-০৬	৫-৩৪	১২-০৫	৪-৪১	৬-৪১	৭-৫৭
১৫ই আগস্ট	৪-০৯	৫-৩৫	১২-০৪	৪-৩৯	৬-৩৮	৭-৫৩
২০শে আগস্ট	৪-১১	৫-৩৭	১২-০৩	৪-৩৭	৬-৩৪	৭-৪৯
২৫শে আগস্ট	৪-১৫	৫-৪০	১২-০২	৪-৩৪	৬-২৯	৭-৪৩

নামাজ, সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী

মাস ও তারিখ	সেহরীর শেষ সময় ফজর আরম্ভ	সূর্যোদয় ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইফতারের সময় আরম্ভ	এশার সময় আরম্ভ
	১ ঘঃ মিঃ	২ ঘঃ মিঃ	৩ ঘঃ মিঃ	৪ ঘঃ মিঃ	৫ ঘঃ মিঃ	৬ ঘঃ মিঃ
১লা সেপ্টেম্বর	৪-১৮	৫-৪২	১২-০০	৪-৩১	৬-২৩	৭-৩৬
৫ই সেপ্টেম্বর	৪-২২	৫-৪৩	১১-৫৯	৪-২৯	৬-২০	৭-৩২
১০ই সেপ্টেম্বর	৪-২২	৫-৪৫	১১-৫৭	৪-২৫	৬-১৪	৭-২৬
১৫ই সেপ্টেম্বর	৪-২৩	৫-৪৬	১১-৫৫	৪-২১	৬-০৯	৭-২১
২০শে সেপ্টেম্বর	৪-২৬	৫-৪৮	১১-৫৪	৪-১৮	৬-০৫	৭-১৬
২৫শে সেপ্টেম্বর	৪-২৭	৫-৪৯	১১-৫২	৪-১৪	৬-০০	৭-১১
১লা অক্টোবর	৪-৩০	৫-৫২	১১-৫০	৪-০৯	৫-৫৩	৭-০৪
৫ই অক্টোবর	৪-৩১	৫-৫৩	১১-৪৯	৪-০৪	৫-৫০	৭-০১
১০ই অক্টোবর	৪-৩৪	৫-৫৫	১১-৪৮	৪-০৪	৫-৪৬	৬-৫৬
১৫ই অক্টোবর	৪-৩৪	৫-৫৭	১১-৪৬	৩-৫৮	৫-৩৯	৬-৫১
২০শে অক্টোবর	৪-৩৬	৫-৫৯	১১-৪৫	৩-৫৪	৫-৩৬	৬-৪৮
২৫শে অক্টোবর	৪-৩৮	৬-০১	১১-৪৪	৩-৫০	৫-৩২	৬-৪৪

নামাজ, সেহরী ও ইফতারের সময়সূচী

মাস ও তারিখ	সেহরীর শেষ সময়	সূর্যোদয় ফজরের শেষ সময়	জোহরের সময়	আসরের সময়	মাগরিব ও ইফতারের সময়	এশার সময়
	ফজর আরম্ভ					
	১	২	৩	৪	৫	৬
	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ

১লা নভেম্বর	৪-৪২	৬-০৩	১১-৪৪	৩-৪৭	৫-৩০	৬-৪০
৫ই নভেম্বর	৪-৪৪	৬-০৮	১১-৪৪	৩-৪৫	৫-২৫	৬-৩৮
১০ই নভেম্বর	৪-৪৬	৬-১০	১১-৪৪	৩-৪২	৫-২৩	৬-৩৬
১৫ই নভেম্বর	৪-৪৯	৬-১৪	১১-৪৫	৩-৪১	৫-২১	৬-৩৫
২০শে নভেম্বর	৪-৫২	৬-১৭	১১-৪৬	৩-৩৯	৫-২০	৬-৩৪
২৫শে নভেম্বর	৪-৫৪	৬-২০	১১-৪৭	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৪
১লা ডিসেম্বর	৪-৫৪	৬-২২	১১-৪৯	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৪
৫ই ডিসেম্বর	৫-০৩	৬-২৭	১১-৫১	৩-৩৮	৫-১৯	৬-৩৫
১০ই ডিসেম্বর	৫-০৩	৬-৩০	১১-৫৩	৩-৩৯	৫-২১	৬-৩৭
১৫ই ডিসেম্বর	৫-০৬	৬-৩৩	১১-৫৫	৩-৪১	৫-২২	৬-৩৮
২০শে ডিসেম্বর	৫-০৮	৬-৩৫	১১-৫৭	৩-৪৩	৫-২৪	৬-৪০
২৫শে ডিসেম্বর	৫-১১	৬-৩৮	১২-০০	৩-৪৬	৫-২৭	৬-৪৩

